॥ শ্রীহরিঃ ॥
816▲
কল্যাণকারী প্রবচন
স্বামী রামসুখদাস
GITA PRESS, GORAKHPUR

।। শ্রীহরিঃ ।।

সংসারের আশ্রয় কেমন করে দূর হবে?

আমরা ভগবানের আশ্রিত হই অথবা সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করি দুটি কথার একই অর্থ। সংসারের আশ্রয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেলে ভগবানের আশ্রয় স্বতঃই প্রাপ্ত হয় আর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের আশ্রিত হয়ে গেলে সংসারের আশ্রয় আপনা আপনি দূর হয়ে যায়। এই দুটির কোনও একটিকে প্রাধান্য দিয়ে অথবা দুটিকেই সঙ্গে রেখে যদি চলি তাতে একই অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ কল্যাণ হয়।

ভগবানের আশ্রিত হবার পথে সংসারের আশ্রয়ই প্রধান বাধা। সংসারের আশ্রয় দূর না হবার প্রধান কারণ হ'ল সংসর্গজনিত সুখের আসক্তি। সংসর্গজনিত সুখের প্রতি মনের যে আকর্ষণ, প্রিয়তাবোধ সেটিই হ'ল সংসারের আশ্রয়ের, সংসারে বদ্ধ হওয়ার মূল। এই মূল ছিন্ন হলে সংসারের আশ্রয় দূর হয়ে যাবে। কিন্তু অন্তরে সংসর্গজনিত সুখের প্রতি লোলুপতা থাকলে বাইরে যদি সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, সাধু বনে যাও, টাকা-পয়সা ত্যাগ কর, বস্তুসামগ্রী ছেড়ে দাও, বসতি ত্যাগ করে বনে চলে যাও তাহলেও সংসারের আশ্রয় দূর হবে না। সংসর্গজনিত সুখ আট প্রকারের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সমাদর (শরীরের যত্ন-আত্তি), জাঁক (নামের প্রশংসা) এবং আরাম। এই আট প্রকারের সংসর্গজনিত সুখই প্রধান বাধা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সুখগুলির প্রতি আকর্ষণ থাকে, প্রিয়তাবোধ থাকে, এইগুলি ভাল লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসারের আশ্রয় দূর হয় না এবং সংসারের আশ্রয় ছিন্ন না হলে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের আশ্রিত হওয়া যায় না। আর যদি কেবল ভগবানেরই আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলেও সংসারের আশ্রয় ছিন্ন হয়ে যাবে। সংসর্গজনিত সুখের আকর্ষণ বড় বেশি। কিন্তু তা কখন দূর হবে? যখন মানুষ কেবল ভগবানের আশ্রয় নিয়ে তাঁর ভজন-কীর্তনে মগ্ন হবে। ভগবানের ভজন-কীর্তনে মগ্ন হয়ে গেলে যখন পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হতে থাকবে তখন সংসর্গজনিত সুখ সহজ সরলভাবে দূর হয়ে যাবে। সেই পারমার্থিক সুখে এই বিলক্ষণতা, অলৌকিকতা আছে যে তার সামনে সংসারের সুখ নগণ্য, তুচ্ছ, কিছুই নয়। সেই পারমার্থিক

।। শ্রীহরিঃ ।।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

সুখ যখন প্রাপ্ত হতে থাকবে তখন সংসারের সমস্ত সুখ নীরস হয়ে যাবে, স্বভাবতঃই তুচ্ছ মনে হতে থাকবে। সেজন্য সেই পারমার্থিক সুখকে, আনন্দকেই নেওয়া উচিত। তাকে পাওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। ভাবনার (ভক্তির) মাধ্যমে নিতে পার, আবার বিবেকের (জ্ঞানের) মাধ্যমেও নিতে পার। ভাবনার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে যে—তিনি আছেন, তিনি আমার এবং আমি তাঁরই—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোঈরে।

ভগবানকে আপন মনে করার সঙ্গে সঙ্গে '**দুসরো ন কোঈ**' (অন্য কেউই আমার নয়) এটিও মেনে নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু যা হয় তা হ'ল সংসারকে নিজস্ব করে নিয়ে ভগবানকে নিজস্ব করা হয়। বাস্তবে সংসার নিজস্ব হয় না—এটি নিশ্চিত। জন্মের আগে যেসব আত্মীয় আপন ছিল আজ তাদের মনেই পড়ে না। অনুরূপভাবে আজ যেসব আত্মীয়, যে টাকা-পয়সা, যে ভোগকে আমার একান্ত বলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে তাদের আমার মনেও থাকবে না, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তো দূরের কথা। সুতরাং যা থাকবেই না তাকে ছেড়ে দিতে কতটাই বা জোর লাগবে? যা থাকবে তাকে যদি ছাড়ার কথা বলা হয় তবে এরকম কথা মনে হতে পারে যে, যা থাকবে তাকে ছাড়ি কি করে? কিন্তু সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হবেই, আর তা হয়েই যাচ্ছে; সুতরাং তাকে ছাড়তে কষ্টটা কী? কেবল মূর্খতাবশতই আমরা তাকে ধরে রেখেছি।

একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বাল্যাবস্থায় আমাদের যেসব বন্ধুর সঙ্গে, যেসব খেলনা এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল সেই সম্বন্ধ আজ কেবল স্মৃতিমাত্র। আজ সেই সম্বন্ধ নেই। না সেই অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে, না সেইসব ঘটনার সঙ্গে; না সেইসব খেলনার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, না তখনকার সময়ের সঙ্গে। এখন আপনি যদি বলেন যে আপনার বাল্যাবস্থা এমন ছিল আর আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি যে না সেরকম ছিল না তাহলে আপনার কাছে এমন কোনও প্রবল প্রমাণ নেই যা দিয়ে আপনি আমাকে বোঝাতে পারবেন। আপনি এবং আমি যতই জেদাজেদি করি না কেন 'আমার বাল্যাবস্থা এমন ছিল' এটি আপনি এবং আমি কেউই সিদ্ধ করতে পারব না। যদি সিদ্ধ করতে চাই তো কী বলব, কেমন করে বলব? সেটি জানাবার শক্তি কার আছে? আপনার বর্তমানের অবস্থাকে আপনি যেভাবে সত্য বলে প্রত্যক্ষ করছেন বাল্যকালের অবস্থাকেও তখন সেরূপই সত্য বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আজ

তা প্রমাণ করতে পারবেন না। তাহলে আজ আপনার যা অবস্থা ভবিষ্যতে তাকে প্রমাণ করতে চাইলে কেমন করে করবেন? সেই বাল্যাবস্থার সময় যেমন অতীত হয়ে গিয়েছে তেমনি আজকের সময়ও অতীত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কী হবে, কয়েক ঘণ্টা পরেই বা কী হবে তা জানা নেই। আজ থেকে কয়েক যুগ আগে কী হয়েছিল জানা নেই, আজ থেকে কয়েক যুগ পরে কী হবে তাও জানা নেই। বর্তমানও খুব দ্রুততার সঙ্গে পার হয়ে যাচ্ছে। 'রয়েছে' বর্তমানের নাম নয়, বরং যা চলমান অর্থাৎ দ্রুততার সঙ্গে চলে যাচ্ছে তারই নাম বর্তমান। বর্তমান এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে যে তার একটি মুহূর্তও স্থির নয়। বর্তমান কোনও কাল-ই নয়, কেবল ভূত ও ভবিষ্যতের সন্ধিকে বর্তমান বলা হয়। বর্তমান শব্দের অর্থই হ'ল চলমান। যা ভবিষ্যৎ তা সামনে এসে অতীতে চলে যাচ্ছে। যে ভবিষ্যৎটি অতীতে চলে যাচ্ছে তাকে বর্তমান বলা হয়। এইভাবে যা কখনও স্থির থাকে না ; যার প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছেদ হচ্ছে তার প্রতি বিমুখ হতে কী এমন জোর লাগে, বল? এতো বাধ্যতামূলকভাবে দূর হবেই, থাকবে না। একে রাখতে চাইলে হীনতাবোধ, দুঃখ, সন্তাপ, জ্বালা, চিন্তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু একে যদি দূর করে দাও তাহলে সংসার থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে। সুতরাং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর অথবা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাও—'হে ভগবান! কেবল তুমিই আমার।' ভগবানের নাম নাও, তাঁর চিন্তা কর, তাঁর কাছে কাঁদো আর বলো 'হে প্রভু! সংসারকে ছাড়তে আমি হেরে গিয়েছি, আমার নিজের মনোবৃত্তিগুলিকে বড় প্রবল মনে হচ্ছে।' এইভাবে ভগবানের শরণ নাও। তুলসীদাস বলেছেন—

হৌঁ হার্‌য়ো করি জতন বিবিধ বিধি অতিসৈ প্রবল অজৈ।।
তুলসীদাস বস হোই তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু বরজৈ।।

(বিনয়পত্রিকা ৮১)

আমাদের কাছে এই রিপুগুলি তো সরল নয়। প্রভু কৃপা করলে তবেই এরা সরল হবে। কিন্তু নিজের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার না করলে মানুষ তার শক্তি সম্পর্কে হতাশ হতে পারে না—নিজের অসামর্থ্য সে অনুভব করতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে হতাশ না হলে আমি এত কিছু করতে পারি এই অহঙ্কার দূর হয় না। সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেও কাজ না হলে বলে দাও 'প্রভু! এখন আমি কিছুই করতে পারি না।' তাহলে তখনই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ণ শক্তি না প্রয়োগ করলে এই অনন্যতা আসে না। তাই আপনি যা

করতে পারেন তা পূর্ণোদ্যমে করুন, এতে কোনও সংশয় রাখবেন না, অর্থাৎ নিজের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করুন। এভাবে অসফল হলে যখন অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাবে যে 'আমার শক্তিতে কাজ হবে না' তখন উচ্চৈস্বর নির্গত হবে 'হে নাথ! আমার শক্তিতে হবে না'। আর তখনই ভগবানের শক্তিতে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নিজের শক্তি অবশিষ্ট রেখে ভগবানের অনন্য শরণ নেওয়া যায় না। যদি নিজের শক্তির উপর যৎকিঞ্চিৎও ভরসা এই থাকে যে আমি কিছু করতে পারি তবে তা সম্পূর্ণ করে নাও। যতটা জোর দিতে পার তা পুরোপুরি লাগাও। সমস্ত জোর লাগাবার পর যখন আর জোর বাকি থাকবে না তখন কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে। আবার যদি জোর না লাগালেও সংসারের আশ্রয় দূর হয়ে যায় তাহলেও কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা সংসারের আশ্রয় পরমাত্মার আশ্রয় নিতে দেয় না। তার কাজ এইটুকুই, আবার সে নিজেও অবস্থান করে না।

সংসারের আশ্রয় ব্যাকরণের '**ক্বিষ্**' প্রত্যয়ের মতো। '**ক্বিষ্**' প্রত্যয় নিজে তো অবস্থান করে না, আবার ধাতুর গুণ এবং বৃদ্ধি হতে দেয় না। অনুরূপভাবে সংসারের আশ্রয় স্বয়ং অবস্থান তো করে না, কিন্তু মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ-সদাচার আসতে দেয় না এবং তাকে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হতে দেয় না। সুতরাং সংসারের আশ্রয় মেনে নিলে অবিমিশ্র প্রবঞ্চনাই হবে। এর দ্বারা যদি কিছু লাভ হয় তাহলে জানাও।

শ্রোতা—অনন্ত জন্ম থেকে সংসারের আশ্রয় নেওয়ার সংস্কার রয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী—এসব কিছু নয়, কেবল অছিলা। আপনার মধ্যে এপথে চলার ইচ্ছাই নেই তাই অছিলা করছেন। অছিলার কথা আমি অনেক শুনেছি। কী করি, আমার কাজ ঠিক নয়। কী করি, তেমন ভাল মহাত্মা পাচ্ছি না। কী করি, ঈশ্বর কৃপা করেননি। কী করি, পরিবেশ তো এমনই। কী করি, এইরকম সময়ই তো এসেছে। খুব খারাপ সময় এসেছে, সমাজ কুসঙ্গে ভরে গিয়েছে। কী করি, আমার ভাগ্য তো এইরকমই। কী করি, আমার সংস্কার এইরকম। কোথায় যাব? কী করব? কেমন করে করব? কাকে জিজ্ঞাসা করব? ঈশ্বর আমাকে এইভাবে তৈরি করেছেন। ভগবানের মায়া এইরকম, আমি কী করব?— এইসব একেবারে বাজে কথা। এতে কোনও সার নেই। আমি এগুলি অধ্যয়ন করেছি। এসব যত অছিলা সবগুলিই প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত করার পদ্ধতি। যাতে প্রকৃত লাভ না হয়ে যায় তার জন্য খুঁজে খুঁজে

পদ্ধতি বার করা হয়েছে, আর কিছু নয়। এমন সুন্দর করে কোমর বেঁধেছে যাতে না কোনওভাবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে! এমন সব যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন যে স্বামীজীকে তো এগুলি জীবনে ভোগ করতে হয় না। এঁর তো ঘর-সংসার নেই। এঁর দোকান নেই। ইনি তো বিনিপয়সায় খাবার পান আর বাক্য বিন্যাস করেন। এইভাবে কোনওপ্রকারে এঁর কথা এড়িয়ে যেতে হবে—আপনি ভেবে রেখেছেন। তাই অনেক যুক্তি আপনি পেয়ে যান। দু-চারটি যুক্তি তো সামান্যই। কর্মই যদি বাধক হয় তবে সেই কর্ম আপনি করেছেন, না আর কেউ? আপনার সৃষ্ট সংস্কার যদি বাধক হয় তাহলে তাকে কি আপনি দূর করতে পারেন না? আপনি করেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন, পড়েছেন—এইভাবে আপনি নিজেই আপনার ভিতরে যেসব সংস্কার ঢেলে দিয়েছেন সেইগুলিই সৃষ্ট হয়। আপনার কৃত সংস্কারই জন্মায়। আপনি না করলে কোনও সংস্কারই জন্মাতে পারে না।

কোনও একজন এক সাধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহারাজ! ভগবানে কি করে মন নিবিষ্ট করব?' সাধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'তুমি স্বয়ং ভগবানে নিবিষ্ট হয়ে যাও তাহলে মনও নিজে নিজেই ভগবানে নিবিষ্ট হয়ে যাবে। মন যায় কোথায়? তুমি যেখানে যেখানে নিজের সম্বন্ধ যুক্ত করেছ সেখানে মন যায়।' সে বলেছিল 'মহারাজ! মন তো প্রত্যেক জায়গাতেই চলে যায়।' সাধু বলেছিলেন 'মনে কখনও ভাইসরয়ের চা খাবার ইচ্ছা হয় কি?' 'তা হয় না।' 'কেন হয় না?' কারণ সেখানে আমরা সম্বন্ধ যুক্ত কিরিনি। অতএব আপনি যেখানে সম্বন্ধ যুক্ত করেননি সেখানে মন যায় না। যেখানে আপনি সম্বন্ধ যুক্ত করেছেন সেখানেই মন যায়। আপনি সম্বন্ধ ত্যাগ করুন, মনও যাওয়া ছেড়ে দেবে। সব কাজ নিজেরই করা—

আপ কমায়া কামড়া, কিণনে দীজৈ দোষ।
খোজেজী রী পালড়ী, কাঁদে লীনী খোস।*

নিজের বিচার যদি পাকা হয় তাহলে স্বয়ংই তাকে নিষ্পন্ন করে দেবে। যদি সেটিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে চাও আর নিজের শক্তিতে তা যদি দূর না হয়

---

* নিজেরই কৃতকর্মের জন্য কাকে দোষ দেবেন! 'খোজেজী' নামে এক ঠাকুরের গ্রাম পালড়ীকে লোকেরা 'খোজেজীকী পালড়ী' নাম দিয়েছিল। একবার খোজেজীর গ্রামে খুব বড় কাঁদা (পিঁয়াজ) উৎপন্ন হয়েছিল। সেটি তিনি রাজাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই গ্রামটি 'কাঁদেকী পালড়ী' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর লোকেরা সেই গ্রামকে 'খোজেজীকী পালড়ী' না বলে 'কাঁদেকী পালড়ী' নামে অভিহিত করত।

সেইরকম অবস্থায় আপনি কাঁদবেন। এই বিদ্যাটি আমরা বাল্যাবস্থায় কাজে লাগিয়েছি। বাল্যকালে কোন্ কাজটা কেঁদে আদায় হয়নি? কেঁদে সব কাজ হয়েছে। ছোট শিশু কেঁদে তার মনের কথা পূর্ণ করে নেয়। এই ক্রন্দন দ্বারা আমরা সকলেই কাজ আদায় করেছি। অতএব ভগবানের কাছে কাঁদো তাহলে তাঁকে বাধ্য হয়ে ছুটে আসতে হবে। আমরা ভগবানের প্রিয় সন্তান। আমরা যদি অশান্ত হয়ে কেঁদে পড়ি তাহলে ভগবানের আমাদের উপেক্ষা করার ক্ষমতাই হবে না। তিনি তা করতেই পারেন না।

আমরা সংসারে ভোগ্যবস্তু চাই, সেগুলি সংগ্রহ করতে চাই; এইসব জিনিস কাঁদলেও পাওয়া যাবে না, যদি ভাগ্যে এগুলি পাওয়ার হয় তাহলে পাওয়া যাবে, পাওয়ার না হলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভগবানের জন্য কাঁদলে তিনি তা সহ্য করতে পারবেন না। ভগবান সংসারের দুঃখকে পরোয়া করেন না। যে মানুষ সংসারে সুখ যাঞ্চা করে সে তো এক রকম দুঃখই চায়। ভগবান যেন বলছেন আগে থেকে পাওয়া দুঃখই যথেষ্ট, আর দুঃখ নিয়ে তুই কী করবি? এইজন্য সাংসারিক সুখ চাইলে এবং তার জন্য কাঁদলে ভগবান সাংসারিক সুখ দিয়ে দেবেন, এমন কথা নয়।

জনৈক ভদ্রলোকের স্ত্রী ব্যাধিগ্রস্ত হলে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মারা যান। এখন তিনি ভগবানের প্রতিআস্থা ত্যাগ করেন। তাঁর পরীক্ষায় ভগবান ফেল করেছিলেন; কেননা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর দুঃখ দূর করেন নি, তাঁর স্ত্রীকে বাঁচান নি। কিন্তু মানুষ এই চিন্তা করে না যে আগে দুঃখ বেশি ছিল, তা কম করা হ'ল তো তাতে আপত্তি কী? কিন্তু বুদ্ধিতে এই কথা আসে না। মানুষ তার ইচ্ছামতো জিনিস চাইতেই থাকে। যদি আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ থাকে আর তার জন্য আপনি কাঁদেন তাহলে ভগবান সেইসময় সেটি পূর্ণ করে দেবেন। কেননা তিনি জানেন যে এ আসল জিনিসের জন্য কাঁদছে। যে মিথ্যা বিষয়ের জন্য কাঁদে তাকে কে মান্য করে? সে তো পাগল, বুদ্ধিহীন, মূর্খ।

সংসার থেকে কিছু নেবার ইচ্ছা না রেখেও যদি মনে 'এটি আমার' (আপন-বোধ) এমন ভাব থাকে তবে তাও ভোগ। কেননা সংসারের প্রতি আপন-বোধ দূর হলে দুঃখ হয়। সংসারের প্রতি আপন-বোধ স্থায়ী হয় না। আমরা যদি শরীরকে আপন বলে মনে করি তাহলে আমাদের সেই সম্বন্ধ কি চিরকাল স্থায়ী হবে? শরীর টিকে থাক এই ইচ্ছাই তো মানুষকে বিব্রত করে।

শরীর তো চিরকাল থাকবে না কিন্তু 'এটি আমার' এই ভাবনা থেকে একটা সুখ পাওয়া যায়। এই সুখই বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতিটি সাধকের অর্থাৎ যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি চান তাদের এদিকে বিশেষভাবে সজাগ থাকা উচিত।

এই সংসার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যাবে। এই কথা জানা সত্ত্বেও একে ত্যাগ করতে নিজকে অক্ষম মনে হয়। কিন্তু অক্ষমতা, কঠিনতার কাছে হার স্বীকার কোরো না। যদি ঘাবড়ে যাও তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। চলতে ফিরতে বলো 'হে প্রভু! কী করব? আমার দ্বারা তো কিছুতেই হচ্ছে না।' সংসর্গজনিত যত সুখ ভোগ করেছো তার চেয়ে বেশি যদি দুঃখবোধ জাগে তাহলে সংসারের প্রতি যে সম্বন্ধ তা দূর হয়ে যাবে। এইজন্য সংসারে দুঃখের চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছুই নেই। তবে সেই দুঃখ অন্তরে হওয়া চাই। পরিস্থিতিজনিত যে দুঃখ তা বাইরে থেকে আসে। পুত্র নেই, ধন নেই, মান নেই, এটা নেই, ওটা নেই—এই সবই বাইরের দুঃখ। এইসব হ'ল নকল দুঃখ, আসল দুঃখ নয়। আসল দুঃখ ভিতর থেকে আসে। নিজের প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে না, ভগবানের প্রতি ভালবাসা জাগছে না, ভগবানের দর্শন হচ্ছে না, সংসারের আশ্রয় দূর হচ্ছে না—এইরকম ভেতর থেকে যে দুঃখ হয়, জ্বালা (ব্যথা) হয়, ভগবান তা সহ্য করতে পারেন না।

ভগবানের স্বভাব হ'ল **'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'** অর্থাৎ ভগবান ভক্তের কল্যাণের জন্য কঠোরতায় বজ্রের চেয়েও বেশি কঠোর (পাহাড়-পর্বতকেও টুকরো টুকরো করতে পারে যে বজ্র তার চেয়েও বেশি কঠোর) কিন্তু কোমলতায় কুসুমের চেয়েও কোমল। সাধুদের জন্য বলা হয়েছে—

সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা। কহা কবিন্হ পরি কহৈ ন জানা।
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা। পর দুখ দ্রবহিঁ সন্ত সুপুনীতা।।

(মানস ৭।১২৫।৪)

মাখন তো নিজের তাপেই গলে যায়, কিন্তু সাধুরা অপরের দুঃখ দেখে বিগলিত হন। যখন সাধুরা অপরের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না তখন সাধুদের হিতকারী ভগবান অপরের দুঃখ কি করে সহ্য করতে পারবেন? ভগবানের প্রকৃতিই (স্বভাব) তো সাধুরা পেয়ে থাকেন। ভগবান খুবই শূরবীর কিন্তু অপরের প্রকৃত দুঃখ সহ্য করার ক্ষেত্রে বড়ই ভীরু। এখানে তাঁর বীরত্ব হার মেনে যায়। লোকেরা কী বলবে না বলবে, প্রশংসা করবে, না নিন্দা করবে এসব কথা ধর্তব্যেই আনেন না। গোপীরা বলেন, 'লালা, তুমি যদি নাচো তো

আমরা তোমায় ছানা খাওয়াব।' ভগবান তখন নাচতে থাকেন। যাঁর স্ফুরণমাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হয়ে যায় সেই ভগবান গোপীদের সামনে নাচতে থাকেন। আমার যে এতে কত অসম্মান হচ্ছে তা তিনি গ্রাহ্যই করেন না। সেই ভগবান কি আজ বদলে গিয়েছেন? যদি আমরা সংসারমুক্ত না হতে পারায় দুঃখিত হয়ে যাই তাহলে কি তিনি আমাদের দুঃখ সহ্য করতে পারবেন? পারবেন না। তাঁর কৃপায় সংসারের বন্ধন আমাদের দূর হবে।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

প্রাপ্ত এবং প্রতীতি

দুটি জিনিস আছে—প্রাপ্ত এবং প্রতীতি। এই দুটির মধ্যে প্রভেদ আছে। 'প্রাপ্ত' হ'ল পরমাত্মা এবং 'প্রতীতি' হ'ল সংসার। যা প্রাপ্ত রয়েছে তাকে দেখা যায় না আর যা প্রতীত হয় তার কোনও অবস্থান নেই।

'আমি'—এই যে আপন সত্তা, নিজস্বতা, এটি প্রাপ্ত বিষয়। তার কারণ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সমাধি এবং মূর্ছা—এইসব অবস্থায় আপন-সত্তা কখনওই নিঃশেষ হয়ে যায় না। কিন্তু এই সত্তাকে দেখা যায় না। যে শরীর এবং সংসারকে দেখা যায় তার কেবল প্রতীতিই হয়, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই।

যা প্রাপ্ত হয়েছে তার কখনও নাশ হয় না। তা সবসময় সকলের প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার প্রতীতি হয় না অর্থাৎ তার জ্ঞান 'ইদংতা' অর্থাৎ তর্জনি সংকেতের মত করে হয় না। যেমন, চোখের দ্বারা সংসারকে দেখা হয়, কিন্তু চোখকে কি দিয়ে দেখা যাবে? সেইরকম যিনি সবাইকে জানেন, সকলের আশ্রয়, সকলের প্রকাশক তাঁকে কি দিয়ে দেখা যাবে? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১৪)

কিন্তু যেমন যার দ্বারা এই সংসার দৃষ্ট হয় তা চোখ, তেমনই যার সত্তার দ্বারা এই সংসার প্রতীত হয়, যার আশ্রয়ে সংসার অবস্থিত, যার প্রকাশে সংসার প্রকাশিত সেইটিই প্রাপ্ত (পরমাত্মতত্ত্ব)।

যা প্রতীত হয় সেই সংসার কখনও এক রূপে থাকে না। তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এটি কোনও অজানা কথা নয়। এটি সহজ সরল সকলের

অনুভূত কথা। সংসার যদি 'স্থিত' হত তাহলে তার পরিবর্তন কিভাবে হত? কিন্তু এইসব কথা জেনেও আমরা তাকে স্বীকার করি না। বরং সংসার 'স্থিত' বলেই মেনে নেই। যাঁর সত্তা থেকে এই সংসার প্রকাশিত, যাঁর আধারে এটি দৃষ্ট হয় তাকে প্রাপ্ত করা খুব কঠিন বলে মেনে রেখেছি। এটি খুবই আশ্চর্যের কথা যে যা নিত্যপ্রাপ্ত তাকে অপ্রাপ্ত বলে মনে করেছি আর যা প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে তাকেই প্রাপ্ত বলে মনে করেছি।

জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।।

(মানস ১।১১৭।৪)

পরমাত্মার সত্তার দ্বারাই এই জড় মায়া (সংসার)-কে মূঢ়তাবশত সত্যের মত দেখায়। মূঢ়তাবশত একে সত্য বলে মনে হলেও বাস্তবে এ সত্য নয়। এই সংসারকে দর্শনকারী ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি এবং দর্শনীয় সংসার—এই দুটি এক জাতীয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির প্রকাশক জীবাত্মা এবং সমগ্র সংসারের প্রকাশক পরমাত্মা—এই দুটিও এক জাতীয়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, কেননা তা নিত্য বিরাজমান আর শরীর এবং সংসার সর্বদাই অপ্রাপ্ত থাকে, কেননা এগুলি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, প্রবাহিত হয়, তা টিকবে কি করে? টিকতেই পারে না। এটি বাস্তব সত্য। আপনার যা শিশুকাল তা কোথায় চলে গিয়েছে? আগে যে পরিস্থিতি ছিল তা কোথায় গেল? এই সবই 'নাস্তি'তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যে 'নাস্তি'-কে জানে তাঁর 'নাস্তি' কি করে সম্ভব? সে তো 'অস্তি'-ই আছে। সে নিজে যদি নাস্তি হয় তাহলে 'নাস্তি'-কে জানবে কে? তাহলে 'নাস্তি'-কে জানবার জন্য কী করবে? কিছুই করবে না। কিছু না করার অর্থ আলস্য, অকর্মণ্যতা, প্রমাদ নয়। কিছু না করার অর্থ হ'ল যা 'অস্তি' তাতে স্থিত হওয়া। গীতায় বলা হয়েছে—'**আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।**' (৬।২৫)। তাৎপর্য হ'ল যে আত্মা সর্বত্রই বিরাজিত ('**অততি সর্বত্র গচ্ছতি ইতি আত্মা**') অর্থাৎ যা সর্বত্র পরিপূর্ণ তাতে স্থিত হয়ে কিছুই চিন্তন করবে না। কারণ হ'ল পরমাত্মার যদি চিন্তন কর তাহলে নিজের স্থিতি থেকে নিচে নেমে যাবে। পরমাত্মাকে নিজের থেকে আলাদা মনে করলেই চিন্তন হবে, কেননা চিন্তনে যাকে চিন্তা করা হয় আর যে চিন্তা করে দুজনে ভিন্ন। এজন্য 'অস্তি'-তে স্থিত হয়ে থেমে যাও—এই যুক্তি খুবই শ্রেয়। থেমে গেলে 'অস্তি'-তে আপনার স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুভূত হবে। এই স্বতঃসিদ্ধ স্থিতিকে গীতা '**স্বস্থঃ**' (১৪।

২৫) নাম দিয়েছে। বাস্তবে সব মানুষই 'স্ব'-তে স্থিত থাকে, কিন্তু ভ্রমবশত নিজের স্থিতিকে 'পর' (শরীর)-এর অন্তর্গত বলে মনে করে।

গীতা বলেছে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।'** (১৩। ২০) অর্থাৎ পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু হয়ে যান। কি রকম পুরুষ সুখ-দুঃখের উপভোক্তা হন? **পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্** (১৩। ২১) অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণগুলির, সুখ-দুঃখের উপভোক্তা হন। তার সুখ-দুঃখে সমভাব কখন হয়? 'স্ব'-তে স্থিত হবার পর। 'স্ব'-তে স্থিত হতে কি কোনও পরিশ্রম করতে হয়? 'স্ব'-তে স্থিতি তো আছেই। এজন্য কিছুই চিন্তন কর না। এই অবস্থায় যতটা অপেক্ষা করতে পার করতে থাক। কিছু যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলেও সেদিকে মন দিও না। তা নিজে থেকেই দূর হয়ে যাবে। যা সৃষ্টি হয় তার নাশও হয়। সৃষ্টির পর প্রধান কাজই হ'ল তার নাশ হয়ে যাওয়া। অতএব বিনাশশীল বস্তুর উপর মন দেওয়া কেন? যদি এসে থাকে তো আসুক, চলে গিয়েছে তো যাক। তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে, আবার শান্ত হয়ে যাবে। এতে রাজী বা গররাজী কেন হবে? বিলীন হওয়ার কালে যদি কোনও কিছু দৃশ্যমান হয় তাতে ক্ষতি কী হ'ল? তাকে ভাল বা মন্দ মনে করলেই ফেঁসে যেতে হবে। তা যদি এসে থাকে তাহলে তাকে যেতে দাও। তাকে উপেক্ষা কর, তার প্রতি উদাসীন হয়ে যাও।

মানুষ মনকে থামাতে অনেক পরিশ্রম করে, কিন্তু মন থামে না। মনকে থামাতে হবে না। মনকে থামাতেও হবে না, চালাতেও হবে না। মন যেমন আছে তাকে তেমনই ছেড়ে দাও; তাকে উপেক্ষা কর, তার প্রতি উদাসীন হয়ে যাও। তখন সংকল্প-বিকল্প আপনা থেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ঐগুলি তো নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। জেনে শুনে ঐগুলিকে শেষ (দূর) করার ঝামেলা কেন নেবে? ঐগুলিকে দূর করার চেষ্টা মানেই হ'ল ঐগুলির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া।

ভগবান নিজে থেকে কোথাও বলেননি যে মনকে বশে রাখতে প্রয়াস করা দরকার। বরং **'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ'** (৬। ২৫) কথার দ্বারা নিবৃত্ত হতে বলেছেন। মনকে বশীভূত করার সম্পর্কে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাঁকে জানিয়েছিলেন যে প্রয়াস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করা যায় (৬।৩৩-৩৫)। অর্জুন দুটি শ্লোকে প্রশ্ন করেছিলেন আর ভগবানও দুটি শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছিলেন। কোনও প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এত কম কথা কোথাও

বলেননি। দুটি শ্লোকের মধ্যেও ভগবান অর্ধেকটিতে উত্তর দিয়েছেন আর অর্ধেকটিতে অর্জুনের কথার সমর্থন করেছেন। আবার ভগবান বলেছেন যে মনকে কেবল ধরলেই মুক্তি হয় না, মনকে বশ করা চাই—

অসংযতাত্মনা যোগী দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ।।

(গীতা ৬/৩৬)

'যার মন বশে নেই, উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ সাংসারিক ভোগে যার রুচি তার পক্ষে যোগ প্রাপ্ত করা কঠিন। কিন্তু যার মন বশীভূত, এমন যত্নশীল সাধকের পক্ষে যোগ প্রাপ্ত হতে পারে।' মনকে বশীভূত করার অর্থ এই নয় যে মনকে আমি আঁকড়ে রাখি। তাতে অভিনিবিষ্ট হয়ে যাই। **মনের বশীভূত না হওয়াই হ'ল মনকে বশ করে নেওয়া।** এইভাবেই ভগবান ইন্দ্রিয়গুলির তথা রাগ-দ্বেষের বশে না হওয়ার কথা বলেছেন—'**রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু .... প্রসাদমধিগচ্ছতি।।**' (২।৬৪) ; '**ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ....পরিপন্থিনৌ।।**' (৩। ৩৪) **বশীভূত না হওয়ার অর্থ হ'ল তার কথানুসারে কাজ না করা এবং তার দশা দেখে চিন্তিত না হওয়া।** ও যেভাবে বইছে, বইতে দাও। নিজে তা থেকে আলাদা থাক, নিরপেক্ষ থাক। বাস্তবে আপনি তার সাপেক্ষ নন। আপনি তার সঙ্গে থাকেন না। সে তো বদলে যায়, আপনি বদলান না। আপনি তার থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এইভাবে নিজেকে তার থেকে ভিন্ন জানতে হবে।

মন চঞ্চল হলে আপনার কী যায় আসে? আপনি তো যেমনকার তেমনই আছেন, আর সে বাহিত হচ্ছে। এটিও এক খেলা। মনকে ঠিক করতে বছরের পর বছর লেগে যায়, তবু মন ঠিক হয় না। ঠিক হবে কি করে? ও তো ঠিক হবারই নয়। আপনি তো বরং ওকে শক্তি দেন, তাকে চঞ্চল করে দেন আর বলেন যে মনকে আটকাচ্ছেন। সংসারকেই স্মরণ করেন আর বলেন যে ভগবানের ভজন-পূজন করছেন। ঘণ্টাখানেক একান্তে বসলেন; এর মধ্যে কতক্ষণ ভগবানের স্মরণ হ'ল? ভগবানকে তো স্মরণ করতে হয়, কিন্তু সংসার নিজে থেকেই স্মরণে এসে যায়। এই বিষয়ে খুব শান্তভাবে একটি কথা বোঝা দরকার তা হল যা নিজে থেকেই স্মরণে এসে যায় (স্ফূরণ হয়) তার জন্য আপনি দায়ী নন। অতএব যা স্বতঃই মনে ভাসে (স্ফূরণ হয়), তার জন্য এত ভাবনার প্রয়োজন নেই। যা আপনা থেকে উদিত হয়, আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায় আপনি তার ঝামেলায় কেন যান? কিছু করলেই মানুষের দায় এসে যায়। যা আপনি করেন না, বরং যা নিজে থেকে স্ফূরণ হয় তার দায়

আপনার নয়। আপনি যুবাবস্থা থেকে ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন; এতে আপনাকে কি কোনও জবাবদিহি করতে হবে? আপনি কি কোনও অন্যায় করেছেন? এইভাবে আপনি সংসারকে স্মরণ করেন না, কিন্তু সংসার নিজে থেকেই স্মরণে এসে যায় তো তার দায় আপনার নয়। সেইজন্য আপনি নিজের দিক থেকে কিছু চিন্তা করবেন না—**'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'**(গীতা ৬/২৫)। চিন্তা যদি এসে যায় তো সে যেমন এসেছে তেমনি চলে যাবে। আপনি তাতে সামিল হবেন না। এটি খুবই ভাল যুক্তি। আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলছি যে এই যুক্তি অনেক বছর পরে আমি পেয়েছি। আপনি এই যুক্তিকে এখনই কার্যকর করুন। মনকে উপেক্ষা করুন। ব্যাস, তাহলেই আসল ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন। মনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাতে অভিনিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা তত ভাল উপায় নয়। কেননা এরকম করলে সে সত্তা লাভ করবে, তার গুরুত্ব হবে। যা নেই তাকে দূর করতে চেষ্টা করার অর্থ হ'ল তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া।

চিন্তন হয় অতীত কালের জন্য, নয়তো ভবিষ্যৎ কালের জন্য। বর্তমানের জন্য চিন্তা হয় না। তাই বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই তাকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে ভুল হবে। তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাকে দূর করতে গেলে তাতে সে দূর হবে না, বরং তাতে তাকে দৃঢ় করা হবে। যে ঘটনা গত হয়েছে তা এখন নেই, আর যে ঘটনা ভবিষ্যতে হতে পারে তাও এখন নেই। যা এখন নেই তাকে ধরতে চাও, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, কিন্তু যে পরমাত্মা এখন রয়েছেন তাঁর দিকে দৃকপাতও কর না। বর্তমানে কেবল পরমাত্মাই আছেন, তাঁকে স্বীকার কর না আর বাস্তবে যা নেই তাকে স্বীকার কর। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের কোনও অস্তিত্বই নেই। ভূত এবং ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণকে বর্তমান বলা হয়। পরমাত্মাই তো কেবল বর্তমান। ভগবান বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।

(গীতা ৭।২৬)

'যে প্রাণী অতীত কালে হয়ে গিয়েছে, যে বর্তমানে রয়েছে আর যে ভবিষ্যতে হবে সেইসবকে আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।'

এখানে **'অহং বেদ'** পদে কেবল বর্তমান কাল প্রয়োগ করার তাৎপর্য হ'ল পরমাত্মার কাছে সবকিছুই বর্তমান। অতএব বর্তমানে সত্তারূপে এক পরমাত্মাই আছেন। তাহলে তাঁর চিন্তন কী করব? তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থাকব।

তিনি আমার, আমি তাঁর। তিনি আমার মধ্যে রয়েছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত' (গীতা ১৩/২) অতএব তাঁকে প্রাপ্ত করতে অসুবিধা কিসের? তাঁকে প্রাপ্ত করার মতো সহজ কাজ আর নেই। কিন্তু সহজ তখনই বলা যায় যখন কিছু করতে হয়। যখন কিছুই করতে হয় না তখন তাকে সহজ কি করে বলব? তাকে কঠিন মনে করেছি বলে কঠিনতার ভাব দূর করবার জন্য বলি যে এটি তো খুব সুগম।

পরমাত্মা আছেন এবং তিনি সর্বদাই প্রাপ্ত—এতে দৃঢ় থাকতে হবে। যতই ওলট-পালট হোক না কেন তিনি সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকেন। সংসার নিরন্তর প্রবাহিত, কিন্তু সেই পরমাত্মা 'অস্তি' রূপে একই রকম থাকেন।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

আমি-আমার ভাব কেমন করে দূর হবে?

আমি শরীরের, শরীর আমার—এরকম মনে করা খুবই ভুল। এটিই হ'ল আসল ভুল। ভেবে দেখুন, যে শরীর পাওয়া গিয়েছে আর যে-জিনিস পাওয়া যায় তা নিজস্ব হতে পারে না। যা নিজস্ব তা চিরকাল নিজস্বই থাকে, কখনও বিচ্ছেদ হয় না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজস্বই থাকে। কিন্তু প্রাপ্ত জিনিস সর্বদা সঙ্গে থাকে না, বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাহলে তা নিজস্ব কি করে হতে পারে? স্বয়ং আগেও ছিল আবার পরেও থাকবে, মাঝে শরীর পাওয়া গিয়েছে তো সে স্বয়ং কি করে হ'ল?

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।

(গীতা ১৩।১)

অর্থাৎ 'এই' রূপে কহতব্য শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলা হয় আর এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তাঁকে গুণীজনেরা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেন। অতএব ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দুটি ভিন্ন। যেমন 'আমি' স্তম্ভ জানি, তাহলে স্তম্ভ জানার বস্তু আর আমি হলাম যে জানে। যা জানা যায় আর যে জানে দুটি হল ভিন্ন বস্তু—এইটিই নিয়ম। আমরা শরীরকে জানি, অতএব আমরা শরীর থেকে ভিন্ন। আমরা বলি—এটি আমার পেট, এটি আমার পা, এটি আমার ঘাড়, এটি

আমার মাথা, এগুলি আমার ইন্দ্রিয়, এটি আমার মন, এটি আমার বুদ্ধি ইত্যাদি। যা 'এটি' তা আমি (স্বরূপ) কি করে হতে পারে? 'অহং' অর্থাৎ আমিত্বও হ'ল 'এই'। যে আলোকে ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি দেখা হয় সেই আলোকে 'অহং'ও দৃষ্ট হয়। যা দৃশ্য হয় তা নিজস্ব স্বরূপ কেমন করে হতে পারে?

আমি এই শরীর নই—এই কথাটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নাও। আমি কখনও শরীর ছিলাম না। কখনও শরীর হতেও পারি না, শরীর হব না, বর্তমানেও আমি শরীর নই। আমি শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। তা কি করে জানা যাবে? আমি যদি শরীর থেকে ভিন্ন না হতাম, শরীরের সঙ্গে আমি যদি এক হয়ে যেতাম তাহলে মৃত্যুর পর শরীরও আমার সঙ্গে চলে যেত অথবা শরীরের সঙ্গে আমিও থেকে যেতাম। কিন্তু না শরীর আমার সঙ্গে যায় আর না আমি শরীরের সঙ্গে থেকে যাই ; তাহলে শরীর আমি হ'ল কি করে? যেমন বাড়ি থেকে আমি চলে গেলে বাড়ি আমার সঙ্গে যায় না, বাড়িটা এখানেই থাকে আর আমি চলে যাই। অতএব বাড়ি এবং আমি ভিন্ন, এক নয়। এইরকম, শরীর এবং আমি দুটি আলাদা, এক নয়—এই বোধ যথাযথভাবে হলে আমিত্ব দূর হয়ে যায়।

আমি শরীর, শরীর আমার এবং শরীর আমার জন্য—এই তিনটি বিশেষ ভ্রম। বাস্তবে না তো আমি শরীর, না শরীর আমার আর না শরীর আমার জন্য। শরীর আমার জন্য নয় কেমন করে? আমি প্রতিনিয়ত অবস্থিত আর শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই শরীর প্রতিনিয়ত আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। এমন একটি মুহূর্তও নেই যখন আমার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ না হচ্ছে। লোকেরা মনে করে যে যখন শরীরের মৃত্যু হয় তখন শরীরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় ; অতএব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীর আমাদের থাকে। কিন্তু এটি খুব স্থূল দৃষ্টিতে মানা হয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে প্রতিমুহূর্তে শরীরের মৃত্যু হচ্ছে। ধরা যাক কারও আয়ু একশ বছর আর তার বয়স এখন এক বছর, তাহলে কি একশ বছর তার বাকি থাকবে? এখন তো নিরানব্বই বছর বাকি। দৃষ্টি এই দিকে দেওয়া হয় যে ছেলে বড় হচ্ছে—একেবারে ভুল, ছেলে তো ছোট হচ্ছে। আমরাও মনে করি যে আমরা বড় হচ্ছি, আমরা জীবিত রয়েছি—একেবারে মিথ্যা কথা ; আসল কথা যে আমরা মারা যাচ্ছি। যেমন আমরা এটা জানি যে মৃত্যুর পর শরীর থেকে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায় ঠিক তেমনই প্রতিমুহূর্তে আমরা শরীর থেকে সরে যাচ্ছি। সুতরাং যা সর্বদা বিমুক্ত হয় তা 'আমার জন্য' কেমন করে হতে পারে? ভেবে দেখুন যে শরীরের ওপর আমার

আধিপত্য কি চলে? যদি চলে তাহলে শরীরকে অসুস্থ হতে দিও না, দুর্বল হতে দিও না, অন্তত মরতে তো দিও না। এইরকম আধিপত্য যখন আমার চলেই না তাহলে সে 'আমার' কেমন করে হ'ল? বাল্যাবস্থায় যে আমি ছিলাম সেই আমি এখনও আছি। আপন-সত্তা তো সবসময় যেমনকার তেমনই থাকে, কিন্তু শরীর সর্বদা বদলায়। অতএব শরীর 'আমি' হ'ল কি করে?

শরীরের ঐক্য কেবল সংসারের সঙ্গেই আছে। যে পাঁচটি তত্ত্বের দ্বারা এই সংসার গঠিত সেই পাঁচটি তত্ত্বের দ্বারা এই শরীরও গঠিত—

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।

(মানস ৪/১১/২)

আমরা শরীরকে পেয়েছি সংসারের সেবা করবার জন্য, নিজেদের সেবার জন্য নয়। শরীর আমাদের কী রাজা-উজির করে দেবে? শরীর আমাদের কোন্ কাজে আসবে? শরীরকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে না করে বরং সংসার ও সংসারের জন্য মনে করে তাকে সংসারের সেবায় নিযুক্ত করে দাও—এতেই আমাদের কাজ হবে।

আপনাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই শরীরের দ্বারাই তো আমরা জপ করি, ধ্যান করি, চিন্তা করি, সেবা করি, তাহলে এই শরীর আমাদের কাজই তো করছে। বাস্তবে শরীর আপনাদের কাজে আসেনি। কারণ কোনও ক্রিয়া এবং পদার্থ আপনাদের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছায় না। আসলে জপ, ধ্যান প্রভৃতি করলে বিবেক বিকশিত হয় এবং অন্তঃকরণ থেকে সংসারের গুরুত্ব দূর হয়ে যায়। বিবেকের পূর্ণ জাগৃতি হলে সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সংসারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ামাত্রই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতি হয়ে যায়। কেননা নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতি জড় শরীর-সংসারের দ্বারা হয় না, বরং শরীর-সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই হয়। শরীর-সংসারের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ বিবেকের দ্বারা হয়, ক্রিয়াতে হয় না। অতএব শরীর আমাদের কাজে আসে না শরীর থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই আমাদের কাজে আসে।

শরীরকে নিজের বলে মনে করলে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হবে। আমরা পরমাত্মার চিন্তা করলে তাতেই মন-বুদ্ধি নিয়োগ করি। মন-বুদ্ধি প্রকৃতির, নাকি আপনার? এরা তো প্রকৃতির। প্রকৃতি 'পর' আর আপনি স্বয়ং 'স্ব'। সুতরাং পরমাত্মার চিন্তায় আপনাকে পরাধীন (পরের অধীন, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধীন) হতে হবে, জড়ের সাহায্য নিতে হবে। ধ্যান করলে জড়ের

সাহায্য নিতে হবে। সমাধি করলে জড়ের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু চিন্ময়তাতে স্থিতি জড়কে ত্যাগ করেই হবে। জড়ের সাহায্য নিলে, জড়ের প্রয়োজন অনুভব করলে তাকে কি করে ত্যাগ করবে? যেহেতু শরীরাদি জড় বস্তুগুলি হতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদেই কল্যাণ হয় তাহলে এই শরীরাদি আমাদের কী প্রকৃত কাজে লাগল?

শরীর আমাদের জন্য কি করে হ'ল—এই কথাটি খুব ভাল করে বুঝুন। আপনারা ভজন-পূজন করলেন, দান-ধ্যান করলেন, সেবা করলেন, কিন্তু এইগুলি তখনই কল্যাণকারী হবে যখন আপনার মধ্যে এই ভাব জাগ্রত হবে যে এগুলি আমাদের নয়, আমাদের জন্য নয়। প্রশ্ন হ'ল এগুলি যখন আমাদের এবং আমাদের জন্য নয় তাহলে এগুলি কেন করব? এর উত্তর হ'ল যে আমরা অপরের কাছ থেকে নিয়েছি। শরীরও অন্যের থেকে পাওয়া। অন্ন-জলও অন্যের থেকে পাওয়া। আলো-বাতাসও অন্যের থেকে পাওয়া। আমরা যে পথে চলি, সেই পথও অন্য কেউ তৈরি করেছে। ছায়াও অন্যের থেকে পাওয়া, বাড়িও অন্যের থেকে পাওয়া। অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস অন্যেরই হয়ে থাকে। পুরোটা ভগবান জানেন। ব্যাসদেব জানেন, আমি তো ভাই জানি না। আমি মোটেই বিদ্বান নই, কিন্তু আমার ধারণায় '**দেশে কালে চ পাত্রে চ**' (গীতা ১৭/২০)—এর অর্থ হ'ল—'দেশ, কাল এবং পাত্র প্রাপ্ত হলে' (**প্রাপ্তে সতি**)। 'অনুপকারিণে'—এর অর্থ এটি নয় যে উপকারীকে দান দিও না, বরং যে উপকার করেছে তাকে কিছু দিলে সেটিকে দান মনে কর না। 'অনুপকারী'-র অর্থ হ'ল—যে আগে কখনও আমাদের উপকার করেনি ; তারও সেবা-উপকার কর যাতে ঋণ শোধ হয়ে যায়। আগেকার ঋণ শোধ করতে হবে। নতুন ঋণ নেওয়া যাবে না। এটি যেন আমি পেয়ে যাই, এ আমার কথা শুনুক, মেনে নিক— এরকম ইচ্ছা থাকলে ঋণ বাড়তে থাকবে। জড় আপনার কী কাজে আসবে? আপনি তো চৈতন্যময়। তাহলে আমরা কী করব? জড়তার বন্ধন দূর করতে হলে হয় সংসারের সেবা অথবা ভগবানের সেবা করুন কিন্তু নিজের জন্য কিছু করবেন না। গীতায় বলা হয়েছে—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

(গীতা ১৭/২০)

'দান দেওয়া কর্তব্য—যে দান দেশ, কাল এবং পাত্র লাভের পর অনুপকারীকে এই মনোভাব নিয়ে দেওয়া হয় তাকেই সাত্ত্বিক দান বলা হয়েছে।'

—এই শ্লোকে ব্যাকরণের একটি আশ্চর্য কথা রয়েছে। ভগবান **'অনুপকারিণে'** পদে চতুর্থী বিভক্তি দিয়েছেন এবং **'দেশে কালে চ পাত্রে চ'** পদগুলিতে সপ্তমী বিভক্তি দিয়েছেন। অন্তত **'পাত্রে চ'**-তে সপ্তমী বিভক্তি না দিয়ে **'পাত্রায়'** বলা উচিত ছিল। সেখানে সপ্তমী কেন দেওয়া হ'ল? এর তাৎপর্য হ'ল **'দেশে কালে পাত্রে চ প্রাপ্তে সতি'** অর্থাৎ দেশ, কাল এবং পাত্র লাভ হওয়ার পর যে উপকার করেনি এবং যার কাছ থেকে ভবিষ্যতেও উপকার লাভের আশা নেই এইরকম অনুপকারীকে নিষ্কামভাবে দান দেওয়া 'সাত্ত্বিক দান'। তাৎপর্য হ'ল এই যে দেশ, কাল এবং পাত্র লাভ হওয়ার পর নিজের সম্বন্ধ না রেখে দান দিতে হবে। যদি উপকারীকে দান দেওয়া হয় তাহলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি করলে সেই দান 'রাজস দান' হয়ে যাবে—**'যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ..... তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।'** (১৭/২১) কারণ হ'ল অনুরাগ অর্থাৎ সম্বন্ধ সৃষ্টি করা রজোগুণের স্বরূপ—**'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি'** (১৪/৭)। দানের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে যে 'সাত্ত্বিক দান' বাস্তবে তা দান নয়, তা হ'ল ত্যাগ।

দানের সঙ্গে যেমন আমাদের সম্বন্ধ থাকবে না তেমনই জপ-ধ্যানের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ থাকবে না, সেবার সঙ্গেও সম্বন্ধ থাকবে না। কাউকে সেবা করে যদি মনে করা হয় যে খুব বড় কাজ করেছি তবে তা ভুল। কারণ আমাদের কাছে যা কিছু আছে সেগুলির উপর তারই অধিকার, আমাদের কাছে যে শক্তি রয়েছে সবই সমষ্টির শক্তি। সমষ্টি থেকে বিযুক্ত কোনও শক্তি আমাদের আছে নাকি? বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, অবস্থা প্রভৃতি যা কিছু আমরা পেয়েছি তা সবই সমষ্টির কাছ থেকে পাওয়া। সমষ্টির জিনিস সমষ্টির সেবায় লাগিয়ে এমন আহামরি কী করা হ'ল? যার জিনিস তার কাজে লাগানো হ'ল সততা। সেই জিনিসের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ যুক্ত করলে আমিত্ব এসে যাবে। আমিত্ব এলে আমার ভাবও এসে যাবে এবং 'আমার জন্যও' এসে যাবে।

না এটি আমি, আর না এটি আমার। যা 'এটি' তা 'আমি' নই আর যা 'আমি' তা 'এটি' নয়। শরীর হ'ল 'এটি', মন 'এটি', বুদ্ধি 'এটি', প্রাণ 'এটি', 'আমিত্ব'-ও 'এটি' ; তাহলে এগুলি আমার স্বরূপ কি করে হ'ল? শরীর-সংসারের সঙ্গে স্বীকৃত আমি-আমার ভাবের সম্বন্ধই হ'ল জন্ম-মৃত্যুর কারণ। অতএব এই সম্বন্ধ খুবই তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া উচিত।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

সংসারে থাকার বিদ্যা (কলা)

সংসারে বাস করার বিদ্যা (কলা) যদি আমরা জেনে যাই তাহলে আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। সংসারে থাকারও একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যদি আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারি এবং কাজে লাগাই তাহলে সংসারের বন্ধন কেটে যাবে। যে কোনও কাজই করা হোক সেই কাজ করবার বিদ্যা থাকা চাই। যেমন, কেউ যদি রান্না করে তাহলে সেই কাজ সে না জানলে করতে পারবে না। সে যদি রান্না করতে জানে অথচ রান্না না করে তাহলে ও রান্না হবে না। এইজন্য যে কোনও কাজেই জ্ঞান ও কর্ম দুটিরই প্রয়োজন।

সংসারে থাকার বিদ্যাটি কী তা আমাদের জানা চাই। যেমন, একজন লোক আছেন এবং পরিবারে তার মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বৌদি আছেন, তো তিনি এঁদের মঙ্গলের জন্যই শুধু যা করার করবেন। তাঁদের সেবা করবেন, তাঁদের সুখ প্রদান করবেন আর নিজের সুখের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা যেন না করেন। তিনি যদি নিজের সুখের ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর সংসারে বসবাস করার বিদ্যাটি জানা নেই। আপনি যখন নিজের আত্মীয়দের মধ্যে থাকেন তখন আপনি তাঁদের সেবা করেন। কিন্তু আপনি যখন বাইরে যান তখন সেখানে সেবা করেন না, সেবা গ্রহণ করেন। সেখানে কেউ আমাদের পথ বলে দিক, আমাদের সহায়তা করুক, আমাদের থাকার জায়গা দিক, আমাদের জল খেতে দিক, এইরকম বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করুক যাতে আমরা আমাদের যাত্রা ঠিকমতো করতে পারি। এইরকমভাবে সেবা চাইতে থাকলে কল্যাণ হয় না। কারও কাছে কিছু চাইলে আমরা পরাধীন হয়ে যাই, এটি খাঁটি কথা। কিন্তু যেখানে আমরা কারও কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করি না সেখানে আমরা পরাধীন থাকি না, বরং স্বাধীন হয়ে যাই। সংসারে কিছু প্রত্যাশা করাই হ'ল পরাধীন হয়ে যাওয়া। তাই নিজের জন্য প্রত্যাশা না করে অন্যের ন্যায্য প্রত্যাশাকে নিজের সাধ্য মতো পূরণ করলে স্বাধীন হয়ে যাবেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে যখন আমরা অপরের কাছ থেকে কিছুই চাই না, তখন তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করব কেন? এর উত্তর হ'ল তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করলে নিজেদের প্রত্যাশা ত্যাগ করবার সামর্থ্য এসে যাবে। আমরা যদি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতেই ব্যস্ত থাকি তাহলে নিজেদের প্রত্যাশা ত্যাগের সামর্থ্য আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে আর আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন

হয়ে যাব, অনেক নিচে নেমে যাব। আমরা যদি তাঁদের সেবা করতে থাকি তাহলে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব, সংসারে থেকেও সংসারের ঊর্ধ্বে উঠে যাব। একেই মুক্তি বলা হয়। ভগবান বলেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

(গীতা ৫/১৯)

অর্থাৎ যাঁদের মন সাম্যাবস্থায় স্থিত হয়ে গিয়েছে সেইসব মানুষ জীবিত অবস্থাতেই সংসারকে জয় করে নিয়েছেন। সাম্যাবস্থা কী? যে কোনও অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-শোক না হওয়া। সংসারের কোনও পরিস্থিতি আমাদের টলাতে না পারলে সেটিই আমাদের জয় লাভ। যদি সংসারের আনুকূল্য এবং প্রতিকূলতা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহলে আমরা হেরে যাব। আনুকূল্য এবং প্রতিকূলতা কখন আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না? যখন আমরা সংসারে নিজেদের জন্য অবস্থান করব না, বরং সংসারের জন্যই সংসারে থাকব। এইভাবে থাকলে আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠে যাব।

আমাদের মা-বাবা জীবিত থাকলে আমরা তাঁদের সেবা করব, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করব না। কেন তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করব না? শরীর, সামর্থ্য তো তাঁদেরই দেওয়া। আমরা যা কিছু পেয়েছি সব তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি। অতএব তাঁদের দেওয়া শরীর, সামর্থ্য, বুদ্ধি, জিনিসপত্র সবকিছু দিয়ে তাঁদেরই সেবা করা উচিত। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস তাঁদেরই দিতে হবে। দেবার জন্যই আমাদের থাকা, নেবার জন্য নয়। তাঁদের জন্যই থাকতে হবে, নিজেদের জন্য নয়। আমরা যদি নিজেদের জন্য না থাকি তাহলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন না খারাপ ব্যবহার করবেন তার কোনও প্রভাব আমাদের উপর পড়বে না। তাঁদের সেবা কি করে হবে, তাঁদের সুখ কি করে হবে, তাঁরা কি করে আরাম লাভ করবেন, তাঁদের ভাল, তাঁদের উদ্ধার, তাঁদের কল্যাণ কিসে হবে কেবল সেই চিন্তাই রাখতে হবে।

শ্রোতা—এ রকম করলে তো আমরা দুঃখী হয়ে যাব?

স্বামীজী—আমরা তখনই দুঃখিত হব যখন তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু চাইব আর তাঁরা তা দেবেন না। আমরা যদি তাঁদের কাছ থেকে কিছুই না চাই তাহলে আমরা কেন দুঃখিত হব? আমরা তো কেবল তাঁদের সুখের জন্য, আরামের জন্যই থাকি। তাই তাঁদের সুখ প্রদান করাই আমাদের কাজ।

শ্রোতা—তাঁরা যদি আমাদের দুঃখ দেন?

স্বামীজী—তাঁরা যদি আমাদের দুঃখ দেন তাহলে আমাদের তাড়াতাড়ি কল্যাণ হবে। যদি আমরা তাঁদের সেবা করি আর তাঁরা আমাদের দুঃখ দেন তাহলে আমাদের দ্বিগুণ লাভ হবে। প্রথমত, নিষ্কামভাবে তাঁদের সেবা করায় ত্যাগ হবে আর দ্বিতীয়ত, তাঁরা আমাদের দুঃখ দিলে আমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাৎপর্য হ'ল এই যে তাঁরা আমাদের দুঃখ দিলে অন্তঃকরণের পুরাতন অপবিত্রতা দূর হয়ে যাবে আর আমরা নিষ্কামভাবে তাঁদের সেবা করায় অন্তঃকরণে নতুন অপবিত্রতা আসবে না। এজন্য তাঁদের কি করে সুখ প্রদান করা যাবে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সংসারে থাকতে হবে। নিজেদের জন্য কিছু চাওয়া আমাদের কর্তব্য নয়। আমাদের কর্তব্য হ'ল তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করা। তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে দুটি কথা মনে রাখতে হবে—তাঁদের প্রত্যাশা যেন ন্যায্য হয় এবং আমাদের সামর্থ্যানুসারে হয়। যদি তাঁদের প্রত্যাশা ন্যায্য হয় কিন্তু তা পূরণ করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে থাকে তাহলে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলতে হবে "আমরা সমর্থ নই। আমাদের কাছে অত শক্তি নেই। এজন্য আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন।" তবে সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করে দাও। এইভাবেই সংসারে থাক।

পদ্মপাতা জলে থাকে, কিন্তু জলে ভিজে যায় না। কাপড় যেমন ভিজে যায় পদ্মপাতা সেরকম ভেজে না। জল তার উপর মুক্তার মতো টলটল করে। এইভাবে আমরাও যদি সংসারে নিজেদের জন্য না থেকে কেবল অপরের জন্যই থাকি তাহলে আমরাও পদ্মপাতার মতো নির্লিপ্ত থাকব, সংসারে ফেঁসে যাব না। তাই সংসারে কেবল অপরের সেবার জন্যই থাক। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস তাঁদের দিতে থাক এবং তার বদলে কিছু পাবার ইচ্ছাও কোর না। তাঁদের সেবা করলে পুরাতন ঋণ শোধ হয়ে যাবে এবং তাঁদের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার ইচ্ছা না করায় নতুন ঋণও হবে না। আমরা যদি তাঁদের সেবা না করি তাহলে তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ থেকে যাবে এবং আমরা যদি তাঁদের কাছ থেকে চাইতে থাকি তাহলে নতুন ঋণ হতে থাকবে।

কেউ মারা গেলে দুঃখ হয়। সেই দুঃখের দুটি কারণ—এক, তার কাছ থেকে সুখ লাভ করেছি কিন্তু তাকে সুখ দিইনি এবং দুই, তার কাছ থেকে আরও সুখ লাভের আশা আছে। আমরা যদি তার কাছ থেকে সুখ লাভ না করতাম তাহলে তার মৃত্যুতে দুঃখিত হতাম না। যারা আমাদের অপরিচিত,

যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই, তাদের মৃত্যুতে আমাদের দুঃখ হয় না। যেমন, নব্বই কিংবা একশো বছরের অতি বৃদ্ধ মানুষ মারা গেলে তাতে দুঃখ হয় না। লোকেরা তো এমন কথাও বলে যে তাদের মৃত্যু বিবাহের মতো, বড়ই আনন্দের কথা। কারণ কী? তার কারণ তার কাছ থেকে আর সুখের কোনও প্রত্যাশা নেই। সে কোনও রকম সেবা করবে, আরাম দেবে— এমন কোনও আশা নেই। এজন্য তার মৃত্যুতে দুঃখ হয় না। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ বছরের তরুণের মৃত্যু হলে দুঃখ হয়। কেননা তার কাছ থেকে আরও সুখ পাওয়ার আশা থাকে। প্রত্যাশাই হ'ল দুঃখের প্রধান কারণ—

আশা হী পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

(শ্রীমদ্ভা. ১১/৮/৪৪)

তার কাছে আশা না করে তার আশা পূরণ করতে চেষ্টা কর। তার কাছে আশা না করলে তার মৃত্যুতে দুঃখ হবে না। যেমন, পনের বছর বয়স থেকে যে অসুস্থ হয়েছিল এবং সে যখন পঁচিশ বছরের হ'ল ডাক্তার-বদ্যি সবাই জানালো যে আর সে বাঁচতে পারে না, এবার সে মারা যাবে। আমরা দশ বছর ধরে তার সেবা করেছি, তার কাছ থেকে কিছু নিইনি এবং কিছু পাবার আশাও করিনি। তাই তার মৃত্যুতে দুঃখ হবে না। কারণ হ'ল দুঃখ তার মৃত্যুতে নয়। আমরা তার কাছ থেকে যে সুখ চাই, দুঃখ তার ফল।

সংসারে আমরা থাকব, কিন্তু সংসার থেকে সুখ চাইব না, বরং সুখ দিতে থাকব। সেবা করতে থাকব আর সেবা পাবার ইচ্ছা যদি অন্তর থেকে দূর করে দিই তাহলে আমাদের সংসারে অবস্থান এসে গিয়েছে, আমরা মুক্ত হয়ে গিয়েছি। পাবার ইচ্ছার নামই হ'ল বন্ধন। কেউ আমাদের সেবা করলে আমরা সুখী হয়ে যাব এ হ'ল বিপরীত বুদ্ধি। সেবা নিলে তো আমরা ঋণী হয়ে যাব, সুখী কি করে হব? যে পাপী তার মুক্তি হতে পারে, কিন্তু ঋণগ্রস্তের মুক্তি হতে পারে না। পাপী যদি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে অথবা পাপের ফল ভোগ করে নেয় তাহলে সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে অপরের কাছে ঋণী অথবা যে অন্যের প্রতি অপরাধ করেছে তার মুক্তি তখনই হবে যখন অন্যে তাকে ক্ষমা করে দেবে। এজন্য যতদিন আমরা সংসারে ঋণী থাকব ততদিন আমাদের মুক্তি হবে না। যাদের কাছ থেকে আমরা সেবা পেয়েছি এবং যারা আমাদের কাছ থেকে সেবা চায় তাদের যদি আমরা নিষ্কামভাবে সেবা করি তাহলে আমরা ঋণমুক্ত হয়ে যাব।

শ্রোতা—আমরা যাদের সেবা করব তারা ঋণী হয়ে যাবে?

স্বামীজী—তারা ঋণী হবে না। আমরা নিষ্কামভাবে তাদের সেবা করি, তার বদলে তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার ইচ্ছা করি না, তাহলে তারা ঋণী কি করে হবে? দ্বিতীয় কথা, প্রাপ্ত বস্তুকে আমরা নিজেদের বলে মনে করি না, বরং সেগুলি তাদেরই মনে করে তাদের সেবায় লাগিয়ে দিই, তাহলে তারা কি করে ঋণী হবে? অতএব সেবা করলে তারা ঋণী হবে না আমরা ঋণমুক্ত হয়ে যাব, মুক্ত হয়ে যাব।

যদি কোনও দোকানদার তার দোকান বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে সে কী করবে? যাদের কাছ থেকে যা কিছু নিয়েছে তাদের যদি সেগুলি দিয়ে দেয় আর নিজে অন্যকে যা দিয়েছে সে যদি তা ফেরৎ নিয়ে নেয় তো ঠিক আছে, না হলে ছেড়ে দিতে হবে। এরকম করলে দোকান উঠে যাবে। সে যদি তার প্রদত্ত সমস্ত জিনিস ফেরৎ নিতে চায় তাহলে দোকান উঠে যাবে না; কেননা সেগুলি নিতে তাকে কিছু নতুন জিনিস দিতে হবে। এইভাবে তার অপরের কাছ থেকে নেওয়া বাকি থেকেই যাবে। তাই যতক্ষণ না অপরের কাছ থেকে নেওয়া আমরা ছাড়ছি ততক্ষণ দোকান উঠে যেতে পারে না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ না আমরা সংসার থেকে নেওয়া ত্যাগ করছি ততক্ষণ আমরা ঋণমুক্ত হতে পারব না, মুক্ত হতে পারব না। এজন্য নেওয়ার ব্যাপারটাই বন্ধ করে দাও এবং সকলকে কেবল দেওয়া শুরু করে দাও। মা-বাবাকে দিতে হবে, স্ত্রী-পুত্রকে দিতে হবে, দাদা-বৌদিকেও দিতে হবে। স্বামী, শশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ, জা-ননদাইকেও দিতে হবে। সবাইকে দিতে হবে, সকলের সেবা করতে হবে এবং নিতে কিছুই হবে না। নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে কি ফেঁসে গেছ। একটি গ্রামীণ প্রবাদ হ'ল **'গরজ গধানে বাপ করে'** অর্থাৎ গরজ গাধাকেও বাবা করে দেয়। গরজ করলে, পাবার ইচ্ছা করলে মানুষকে এত নিচে নামতে হয় যে গাধারও দাসত্ব করতে হয়। আমাদের যদি নেওয়ার ইচ্ছাই না থাকে তাহলে আমরা ভগবানেরও দাস হই না।

একটি চমকপ্রদ কথা, তাতে মন দিন! আমরা ভগবানের ভক্ত তো হই, তবে দাস হই না। কিন্তু কবে? যখন আমরা ভগবানের কাছ থেকে কিছুই নিতে চাই না। যে ভগবানের কাছ থেকে কিছুই নিতে চায় না সেই ভক্তের জন্য ভগবান বলেন—**'ম্যায় তো হুঁ ভগতনকো দাস, ভগত মেরে মুকুটমণী'** অর্থাৎ আমি ভক্তের দাস, ভক্ত হল আমার মাথার মুকুটের মণি। গীতায় ভগবান বলেছেন যে, অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমী)—এই চার প্রকারের ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমী-ভক্ত শ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তের আমি খুবই প্রিয়

এবং সেও আমার খুবই প্রিয়। চার প্রকারের ভক্তই খুব উদার, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত তো আমার স্বরূপ (৭/১৭-১৮)। কারণ হ'ল, জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের কাছে কিছুই চায় না। অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু তো ভগবানের কাছ থেকে কিছু না কিছু চায়। তারা যদি চায় তো ভগবানের কাছে কি কোনও কমতি আছে! তিনি অর্থও দিতে পারেন, দুঃখও দূর করতে পারেন, তত্ত্বজ্ঞানও দিতে পারেন। দেবার সামর্থ্য তাঁর কাছে পুরোপুরি আছে, কিন্তু সেই প্রত্যাশাকামী ভক্তের মান তাতে নেমে যায়।

ভগবান বলেন, আমি তো দিতে থাকব, অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির এবং প্রাপ্তের রক্ষা করব—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯/২২) ; কিন্তু তুমি চেয়ো না—**'নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব'** (গীতা ২/৪৫) কত বড় কথা বলেছেন! না চাইলে প্রেম হয়, কিন্তু চাইলে প্রেম হয় না, বরং বন্ধন হয়। সে এর কাছ থেকে চায় এবং ও তার কাছ থেকে চায়। তাতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হয় না। দুজনে যদি পরস্পরের কাছে চাইতে থাকে তাহলে দুজনেই প্রতারক। দুজন প্রতারকের মধ্যে প্রতারণা হয় না। সংসারে চাওয়া মানে প্রতারণার মধ্যে যাওয়া। এজন্য প্রত্যাশা ত্যাগ করে সেবা করা উচিত। সংসারে অবস্থানের এইটিই পদ্ধতি।

অতিথি যেমন থাকেন, আপনারা সকলে নিজেদের ঘরে সেইভাবেই থাকুন। যেমন, কোনও সজ্জন অতিথি যদি আসেন এবং রাত্রি বাস করেন তাহলে তিনি বলে থাকেন যে ভাই, আপনারা খেয়ে নিন, যা বাঁচবে তাতেই আমার হয়ে যাবে। আপনারা যে যার নিজের জায়গায় থাকুন, বাড়তি জায়গায় আমি থাকব। যা কাপড়-চোপড় আপনাদের কাজে লাগবে তা আপনারা নিয়ে নিন আর যা বেশি আছে আমায় দিন, তাতেই আমার হয়ে যাবে। কিন্তু রাত্রিতে যদি আগুন লাগে, চোর-ডাকাত আসে, কোনও বিপদ ঘটে, অসুখ হয় তাহলে সকলের আগে সেই অতিথি সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার এই ভাব থাকে যে আমি এঁদের অন্ন-জল খেয়েছি, এখানে বিশ্রাম করেছি, এজন্য এঁদের সেবা করতে হবে, এঁদের সহায়তা করা আমার কাজ। সেই অতিথি যদি এ সবই করে কিন্তু কিছু না নেয় তাহলে সে বাঁধা পড়বে না। সকাল হলেই সে চলে যাবে। কিন্তু তার যদি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে বাঁধা পড়ে যাবে। এইজন্য আপনারা সেবা করুন। যে অল্প অন্ন-জল নিতে হবে তাও সেবা করবার জন্য নিতে হবে। কেননা অন্ন-জল না নিলে সেবা করবেন কি করে?

আমায় এক প্রবীণ সাধু বলতেন যে সংসারে রবারের বলের মতো থাকতে হবে, মাটির গোলার মতো নয়। বল লাফালাফি করে, কোথাও আটকে যায় না। কিন্তু মাটির গোলা যেখানে পড়ে সেখানেই আটকে থাকে। মানুষ যদি সংসারে সেবা করবার জন্য অবস্থান করে, নিজের জন্য না থাকে তাহলে সে সংসারে আটকে যাবে না, মুক্ত থাকবে। এইটিই হ'ল সংসারে অবস্থান করবার বিদ্যা।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমাত্মাকে তৎক্ষণাৎ কি করে পাওয়া যাবে?

শ্রোতা—খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার কি করে হবে?

স্বামীজী—আমার উদ্ধার হোক—এইটিই যদি একমাত্র বাসনা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হয়ে যাবে। একটি কথা আপনারা মন দিয়ে শুনুন। উদ্যোগী হলে তবেই যেমন সংসারের কাজ হয় তেমনিভাবে আমরা মনে করি যে পরমাত্মার প্রাপ্তিও উদ্যোগ করলে হবে। বাস্তবে এই কথা একেবারেই সত্য নয়। পরমাত্মা সব দেশে, সর্বকালে, সমস্ত জিনিসে, সকল ব্যক্তিতে, সকল ঘটনায়, সমস্ত পরিস্থিতিতে আছেন; সেজন্য তাঁকে পাবার জন্য অন্তরে একমাত্র তাঁরই বাসনা হওয়া চাই। কারণ হ'ল পরমাত্মাকে নির্মাণ করতে হবে না, তাঁকে বদলাতে হবে না, কোথাও থেকে তাঁকে আনতে হবে না। তিনি তো সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। যেখানে আপনি বলেন—'আমি,' সেখানেও পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করেন। অতএব কেবল বাসনা হলেই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংসারে কোনও জিনিস কেবল বাসনা করলে পাওয়া যায় না। বাসনা হবে, উদ্যোগ করব, ভাগ্যে থাকবে তবেই কোনও কিছু পাওয়া যায়। যেমন অর্থ চাইলে অর্থের জন্য বাসনা থাকবে, তার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং ভাগ্যে যদি থাকে তবেই অর্থ লাভ হবে। আর ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে ইচ্ছা করলেও এবং খুব চেষ্টা করলেও অর্থ লাভ হবে না। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি কেবল ইচ্ছাতেই হয়ে যাবে। পরমাত্মাপ্রাপ্তির ইচ্ছা হলে উদ্যোগ আপনা থেকে হয়ে যাবে। তবে পরমাত্মাপ্রাপ্তি উদ্যোগের অধীন নয়। যে জিনিস

উদ্যোগের অধীন হয়, ক্রিয়াজনিত হয়—তা বিনাশশীল। যার উৎপত্তি হয় তার বিনাশও হয়। সাধনার দ্বারা যাকে পাওয়া যাবে তা উৎপাদী (যে উৎপন্ন হয়) হবে আর যা উৎপাদী তার নাশ হবে, তা থাকবে না। কিন্তু পরমাত্মা হলেন অনুৎপন্ন তত্ত্ব। আর তিনি সর্বদা যেমনকার তেমনি থাকেন। অতএব কেবল বাসনাতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

কেবল পরমাত্মাপ্রাপ্তিতেই বাসনা হোক, অন্য কোনও কিছুতে যেন বাসনা না থাকে—'**এক বানি করুণানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী।।**' (মানস ৩/১০/৪) অন্য কিছুর বাসনা থাকলে, অন্য দিকে বৃত্তি হলে তবেই পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হয়। যদি অন্য কিছুর বাসনা না থাকে তাহলে পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে বাধা থাকে না, দেরিও থাকে না, দূরত্বও থাকে না। মান-সম্মান, সুখ-আরাম প্রভৃতির বাসনা থাকলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে যায়। অন্য সব বাসনা নাশ হলেই সংসারের সম্বন্ধ দূর হয়ে যায় আর সংসারের সম্বন্ধ দূর হলেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়ে যায়। পরমাত্মা তো আগে থেকেই প্রাপ্ত রয়েছেন। অন্যের জন্য ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা—তারই ফলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে থাকে। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে থাকার জন্য পরমাত্মার অনুভূতি হয় না।

সংসারের জন্য আকাঙ্ক্ষা করলে, উদ্যোগ করলে কোনও কিছুই পাবে না। পরমাত্মা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে—এ ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। সময় মিথ্যা বয়ে যাবে। মানব-শরীর ব্যর্থ হয়ে যাবে, কিছুই পাওয়া যাবে না, কেননা সংসার বিনাশশীল। মানুষেরা মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে, যে অবস্থা আজ নেই সেই অবস্থা যদি এসে যায় তাহলে আমাদের খুব উন্নতি হবে। এটি এক মারাত্মক ভুল। আগে অর্থ ছিল না, এখন তা হয়েছে। তাতে মনে করা হ'ল যে খুব বড় একটি কাজ করেছি। লোকেরাও বলে থাকে যে আগে সাধারণ লোক ছিল এখন লাখপতি-ক্রোড়পতি হয়েছে, কাজের কাজ করেছে। এ মূর্খ ছিল, এখন পণ্ডিত হয়েছে তো খুব বড় কাজ করে ফেলেছে। একে আগে কেউ জানত না এখন সংসারে বেশ প্রসিদ্ধ হয়েছে তো খুব বড় কাজ করেছে। একে আগে কেউ সম্মান করত না, সবাই গাল-মন্দ করত। এখন একে সবাই সম্মান করে তো খুব বড় কাজ করেছে। বাস্তবে কিছুই করেনি। ছিটে-ফোঁটা কাজও করেনি। যে অবস্থা আগে ছিল না তা যদি এখন হয়েও যায় তবুও তা শেষ পর্যন্ত থাকবে না। যা আগেও ছিল না এবং পরেও থাকবে না তাকে লাভ করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। যাঁ সকল দেশ, কাল

প্রভৃতিতে বিদ্যমান সেই পরমাত্মাকে লাভ করার মধ্যেই বাহাদুরি আছে। সেই পরমাত্মা সর্বদা 'বর্তমান' থাকবেন। তিনি কখনও 'নাস্তি' হতে পারেন না।

আপনার স্থিতি পরমাত্মাতে। সংসারে আপনার স্থিতি নেই। আপনার স্থিতি তো অটল আর সংসার আপনার সামনে বদলে যায়। সংসারে আপনার স্থিতি কোথায়? বাল্যাবস্থা বদলেছে, যৌবন কাল বদলেছে, বার্দ্ধক্য বদলেছে, রুগ্ন অবস্থা বদলেছে, নিরোগ অবস্থা বদলেছে, ধনবত্তা বদলেছে, নির্ধনতা বদলেছে—এই সবই বদলাতে থাকবে আর আপনি যেমনকার তেমনি থাকেন। সংসার আপনার সঙ্গে কখনও থাকতে পারে না আর আপনিও সংসারের সঙ্গে কখনও থাকতে পারেন না। ব্রহ্মারও শক্তি নেই যে আপনাকে সংসারের সঙ্গে আর সংসারকে আপনার সঙ্গে রাখেন। আপনার অবস্থান সর্বদা পরমাত্মার সঙ্গে থাকে। পরমাত্মা সবসময় আপনার সঙ্গে থাকেন এবং আপনিও সবসময় পরমাত্মার সঙ্গেই থাকেন। অতএব পরমাত্মাকে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। কঠিন তখন হয় যখন পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য কিছু করতে হয়। যখন কিছু করতেই হয় না তখন তাঁকে লাভ করা কঠিন হবে কি করে? কঠিন বা সহজের প্রশ্নই নেই।

শ্রোতা—কথা তো ঠিক বলেই মনে হয় কিন্তু..........।

স্বামীজী—ঠিক যদি মনে হয় তাহলে কে বারণ করছে? নিজেই তো বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আসলে পরমাত্মাপ্রাপ্তির কোনও পরোয়া আপনি করেন না, প্রাপ্ত হোক আর নাই হোক।

সন্তদাস সংসার মেঁ, কঈ গুগ্ধু কই ডোড।
ডূবন কো সাঁসো নহীঁ, নহীঁ তিরন কো কোড।।

— পেঁচা দিনেরবেলা দেখতে পায় না আর দাঁড়কাক্ রাত্রির বেলা দেখতে পায় না। কিন্তু সংসারে এমন লোক আছে যারা দিনেও দেখতে পায় না, রাত্রিতেও দেখতে পায় না। অর্থাৎ নিজেদের উদ্ধারের দিকে তাদের দৃষ্টি যায় না। তাদের ডুবতেও (পড়ে যাওয়া) চিন্তা নেই আর পার হবার (নিজেদের উদ্ধারের) জন্য উৎসাহও নেই।

কেবল এই বাসনা যদি জাগে যে পরমাত্মার প্রাপ্তি কেমন করে হবে? কী করব? কোথায় যাব? কাকে জিজ্ঞাসা করব? এই বাসনা জোরদার হওয়ামাত্রই পরমাত্মা লাভ হয়ে যাবে। কেননা এই বাসনা জাগ্রত হলেই অন্য বাসনা দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ সংসারের অন্য বাসনা থাকে ততক্ষণ এক অনন্য বাসনা

হয় না। পরমাত্মা অনন্য, কেননা তাঁর সমান অন্য কেউ নেই। এজন্য তাঁকে লাভ করবার বাসনাও অনন্য হওয়া চাই।

শ্রোতা—পরমাত্মার জন্য কি বাসনা আনতে হয়, নাকি তা স্বতঃই এসে যায়?

স্বামীজী—পরমাত্মার জন্য বাসনা স্বতঃসিদ্ধ, অন্য সব বাসনা আপনি তৈরি করেছেন। অতএব সেগুলিকে ছাড়তে হবে। আজ আপনি যে বাসনাগুলিকে জানেন পঞ্চাশ বছর আগে কি সেগুলিকে জানতেন? জানতেনই না। এইজন্য এইসব বাসনা তৈরি করা। কোনও বাসনা একমুহূর্তও টেঁকে না, বরং বদলাতেই থাকে, নাশ হতে থাকে আর আপনি নতুন নতুন বাসনা আঁকড়ে থাকেন।

শ্রোতা—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার প্রচণ্ড বাসনা ছাড়াও কি তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

স্বামীজী—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার প্রচণ্ড বাসনা ছাড়াও, অন্য বাসনা থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগ করা যেতে পারে, ভজন-পূজন করা যায়। কিন্তু এটি দীর্ঘ পথ, এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ পরমাত্মাপ্রাপ্তি হবে না। দু-এক জন্ম, দশ জন্ম, কে জানে কত জন্ম তাতে লেগে যাবে। অন্য বাসনা থাকার ফলেই তো আমরা আটকে রয়েছি। না হলে বাধা কোথায়? যিনি সৎসঙ্গে যুক্ত তাঁর কিছু না কিছু পারমার্থিক বাসনা আছেই, কিন্তু প্রচণ্ড বাসনা না থাকায় পরমাত্মাকে পেতে দেরি হয়।

প্রকৃত অর্থে পারমার্থিক বাসনা ছাড়া কোনও প্রাণীই নেই। কিন্তু পশু পাখি এই জিনিসের সন্ধান জানে না। যে মানুষ জন্তু জানোয়ারের মতো জীবনযাপন করে সেও এর খবর রাখে না। সকলেই সেই তত্ত্বকে চায়। যেমন, কোনও প্রাণী কি মরতে চায়? সকল প্রাণী সর্বদা থেকে যেতেই চায়— এ হ'ল 'সৎ'-কে চাওয়া। কেউ কি অজ্ঞানী হয়ে থাকতে চায়? সকলেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে চায় — এ হ'ল 'চিৎ'-কে চাওয়া। কেউ কি দুঃখী থাকতে চায়? সকলেই সুখী থাকতে চায়— এ হ'ল 'আনন্দ'-কে চাওয়া। এইভাবে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে পাওয়ার ইচ্ছা সকলের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। এটিকে কেউ দূর করতে পারে না, অন্য চাওয়াগুলি যত বেশি ধরে রাখে পরমাত্মাকে পেতে ততই দেরি হবে। অন্য চাওয়াগুলি যতই দূর হবে পরমাত্মাপ্রাপ্তি ততই তাড়াতাড়ি হবে। সকল চাওয়া যদি সর্বতোভাবে মিটিয়ে দাও তাহলে সেই মুহূর্তেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়ে যাবে।

রাজ্যের প্রত্যাশা থাকায় ধ্রুবের পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে দেরি হয়। এই প্রত্যাশার ফলে অন্তিমে তাঁর এই অনুশোচনা হয় যে তিনি ভুল করে ফেলেছিলেন। আপনি যে প্রত্যাশাগুলি পূর্ণ করতে চান সেই প্রত্যাশাগুলির জন্য আপনার অনুশোচনা হবে এবং আপনাকে কাঁদতে হবে। অতএব পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে অন্য বাসনা বাধক— এই কথা মনে রাখলে অন্য বাসনা দূর হয়ে যাবে। অন্য বাসনা পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে কেবল বাধাই দিয়ে থাকে। এতে ইহলোক-পরলোকে বিন্দুমাত্র লাভ হয় না। কেবল ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। অন্য বাসনা তো আধ্যাত্মিক পথে বাধা সৃষ্টি করে। এতে যদি কিছু লাভ হয় তাহলে কেউ বলুক যে অমুক বাসনায় এই লাভ হবে। এতে কেবল ক্ষতিই হয়। শুধু ক্ষতিকেও যদি আপনারা ছাড়তে না পারেন তাহলে কী ছাড়বেন?

শ্রোতা—অন্য বাসনা কিসের উপর টিকে থাকে?

স্বামীজী—অন্য সমস্ত বাসনা সংসর্গজনিত সুখভোগের বাসনার উপর টিকে থাকে। সংসর্গজনিত সুখভোগের জন্য যে বাসনা, মনে যে রুচি, সেইটিই হ'ল বাধক, সুখ ততটা বাধক নয়। আসল রোগ কোথায়—তার কথা তো বহু বছর ধরে আমার নজরে আসেনি। বক্তৃতা দিতে দিতে কয়েক বছর কেটে যাবার পর বুঝতে পারলাম যে মনে সংসর্গজনিত সুখের জন্য যে লোলুপতা সেইটিই হ'ল ব্যাধি। আমার সুখ লাভ হোক, ব্যাস এই ইচ্ছার মধ্যেই যত বাধা। এইটিই অনর্থের মূল, এটিই বিষ।

শ্রোতা—সংসর্গজনিত সুখের বাসনা কি করে দূর হবে?

স্বামীজী—এটি দূর করার খুব সহজ উপায় আছে। কিন্তু একে দূর করতে হবে এই ইচ্ছা আপনার নিজস্ব অর্থাৎ অন্তর থেকে হওয়া চাই। কেননা এটি ছাড়া অন্য কোনও উপায়েই কাজ হবে না। একে আমি দূর করতে চাই—এই বিষয়ে আপনারা যদি মনস্থির করে নেন তাহলে আমার কাছে এমন উপায় আছে যাতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে। আমি বইতে যা পড়েছি এবং সাধুদের কাছে যা শুনেছি তার কথাই বলছি। ভাই-বোনেদের জন্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের জন্য, ছোট-বড় সকলের জন্য সহজ-সরল উপায় হ'ল—অপরের সুখ কি করে হবে? অপরে কি করে আরাম পাবে? অপরের ভাল কি করে হবে? এই বাসনা যদি জাগ্রত হয় তাহলে নিজের সুখের বাসনা দূর হয়ে যাবে। করে দেখ, না হলে আমাকে বোল যে এতে হ'ল না। যুক্তিযুক্ত যদি মনে না হয় তাহলে বলে দাও যে তা মনে হচ্ছে না।

শ্রোতা—এতে ভাগ্যের কি কোনও বাধা নেই?

স্বামীজী— এতে ভাগ্যের কোনও বাধা নেই। এতে ভাগ্য মনে করা কেবল অছিলা মাত্র। ভাগ্য এমনই, সময় এইরকম হয়েছে, ঈশ্বর কৃপা করেননি, ভাল গুরু পাওয়া যায়নি, ভাল মহাত্মা পাওয়া যায়নি, বলে দেবার মতো কাউকে পাইনি। আমার ভাগ্যই এমন—এইসব অজুহাত কেবল পরমাত্মা থেকে বঞ্চিত থাকার উপায়।

এমন কি কখনও হতে পারে যে ঈশ্বর তাঁর প্রাপ্তিতে বাধা দেবেন? নাকি আমাদের কৃতকর্ম আমাদের বাধা দেবে? অথবা আমাদের সৃষ্ট বাসনা আমাদের বাধা দেবে? আমরা নিজেরা কর্ম করেছি, বাসনাগুলি আমরাই তৈরি করেছি। যে জিনিস আমরা তৈরি করেছি তার নাশ আমরাই করতে পারি। গুরু যদি পাওয়া না যায়, তাহলে গুরুর প্রয়োজনই নেই। মহাত্মা না পাওয়া গেলে তাঁর প্রয়োজনই নেই। ভগবান যখন তাঁকে প্রাপ্তির জন্য মনুষ্য-শরীর দিয়েছেন তখন তাঁকে প্রাপ্তির জন্য সামগ্রী কম দিয়েছেন নাকি? গুরুর যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে ভগবানকে স্বয়ং গুরু হয়ে আসতে হবে। তিনি তো জগদ্‌গুরু—'**কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্**'। ভাল মহাত্মা সংসারে থাকবেন কেন? তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত, পরমাত্মাকে লাভ করেছেন এমন মহাপুরুষ সংসারে যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তা কেন? সংসারে এসে তাঁর যা করার ছিল, সেই কাজ তো তিনি পূর্ণ করেছেন; অতএব তখনই তাঁর মরা উচিত ছিল। তাহলেও তিনি যে বেঁচে আছেন তা কেবল আমাদের জন্যই। তাঁর উপর আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যেমন, শিশু যদি দুঃখ পায় তো মা কেন বেঁচে আছেন। মা তো শিশুর জন্যই আছেন, নইলে তাঁর মরে যাওয়াই উচিত। তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে মহাত্মারা সংসারে বেঁচে থাকলে কেবল জীবের কল্যাণের জন্যই বেঁচে থাকেন। এজন্য আমরা যদি মহাত্মা না পাই তো তাঁরা কোথায় যাবেন? তাঁদের পাওয়া যাবেই, তাঁদের ব্যাগ্রতার সঙ্গে আসতে হবে। আমরা যদি অন্তরের সঙ্গে পরমাত্মাকে চাই তাহলে গুরুর প্রয়োজন হলে গুরু নিজে থেকেই এসে যাবেন। ভগবান গুরুকে পাঠিয়ে দেবেন। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। এটি একেবারেই সত্যি। এজন্য ভাগ্য এবং কর্ম কিছুই বাধা নয়। পরমাত্মাকে লাভ করবার প্রবল ইচ্ছা যদি হয়ে যায় তাহলে অনন্ত জন্মের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ

শ্রোতা—ভগবান তো প্রত্যক্ষ হন না, কিন্তু ধনসম্পদকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহলে ধনসম্পদের আশ্রয় কি করে ত্যাগ করব?

স্বামীজী—বাস্তবে ধনসম্পদের কোনও অস্তিত্বই নেই, দেখবেন কি করে? এখন আপনি কি ধনসম্পদ দেখতে পাচ্ছেন? ধনের আশ্রয় সবসময় দেখা যায়, ধনকে সবসময় দেখা যায় না। এই কথাটি খুব চিন্তা করুন। ধনের আসা এবং যাওয়া দেখা যায়, থাকতে দেখা যায় না। ধন আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না। কিন্তু ভগবান আগেও ছিলেন, এখন রয়েছেন এবং পরেও থাকবেন। ভগবানের আসা-যাওয়া নেই। তাহলে একথা কি করে বলা যায় যে ভগবান প্রত্যক্ষ হন না, কিন্তু ধনসম্পদকে দেখা যায়। হ্যাঁ, ভগবানকে লৌকিক বস্তুর মতো চোখে দেখা যায় না। তাঁকে বুদ্ধিরূপ চোখে দেখা যায় আস্তিক ভাবে দেখা যায়।

প্রথমে ধনের আশ্রয় ছিল না, তখন (ছোটবেলায়) ছিল মায়ের আশ্রয়ে পরে ধনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভগবানের আশ্রয় প্রথম থেকে আছে। তাঁর আশ্রয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলছে। তাঁর আশ্রয় আগে ছিল। এখন রয়েছে এবং পরেও থাকবে। কখনও তাঁর আশ্রয়ের অভাব হয় না। কিন্তু ধনের আশ্রয় সর্বদা থাকবে এমন কথা নেই।

ধনসম্পদ সর্বদা সঙ্গে থাকে না। আমরা ধনের সঙ্গে থাকব না আর ধন আমাদের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু ভগবান সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা ভগবানকে ছাড়া থাকতে পারি না। আর ভগবানও আমাদের ছাড়া থাকতে পারেন না। ভগবানের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাব এমন শক্তি আমাদের নেই। শুধু তাই নয়, ভগবানেরও শক্তি নেই যে তিনি আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। যেদিন ভগবান আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন সেদিন আমরা আলাদা ভগবান হয়ে যাব। এইভাবে দুটি ভগবান হয়ে যাবেন, যা মোটেই সম্ভব নয়। অতএব ভগবান আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন না। তাই ভগবানেরই আশ্রয় নেওয়া উচিত।

যার স্বতন্ত্র সত্তা আছে তারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। যার সত্তা পরাশ্রি তার আশ্রয় আমাদের নেওয়া মোটেই উচিত নয়। ভগবানের স্বতন্ত্র স আছে। এজন্য আমাদের উচিত ভগবানেরই আশ্রয় নেওয়া। সেই ভগব কখনও আমাদের থেকে আলাদা হন না। আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব

সামর্থ্যই তাঁর নেই। ভগবান সর্বব্যাপক, সকল দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতিতে তিনি পরিপূর্ণ। অতএব তিনি আমাদের কি করে ছেড়ে দেবেন? যদি ছেড়ে দেন তাহলে তিনি সর্বব্যাপক হলেন কি করে? ভগবানকে ছেড়ে দিয়ে আমরা থাকতেই পারি না। আমরা থাকলে তাঁতেই থাকব, না থাকলেও তাঁতে থাকব, জন্মালে তাঁতে থাকব, মরলেও তাঁতে থাকব আর জন্ম-মৃত্যু রহিত (মুক্ত) হয়ে গেলেও তাঁতেই থাকব। আমরা ভগবানকে ছেড়ে থাকতে পারি না, ভগবানও আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন না। আমরা অপরের আশ্রয় নিয়ে থাকি, এইটিই হ'ল বাধা।

একটি বিশেষ কথা, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কথাটি দুর্বোধ্য কিন্তু খুবই সরলভাবে বলছি। 'আমি আছি'—এই অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। আমি আছি, কি নেই—এতে কোনও সন্দেহ হয় কি? এর জন্য কারও সাক্ষী কি নিতে হয়? কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে বলতো আমি কি আছি? 'আমি আছি'—এই অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবে আছে এবং কোনও কিছুর আশ্রিত নয়। আমি কেমন, আমি কী—তা আমরা না জানতে পারি, কিন্তু 'আমি আছি'—এই অস্তিত্ব বোধে আমাদের কখনওই সন্দেহ হয় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে আমি অনেক জন্মে ছিলাম, এই জন্মেও রয়েছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। এখন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে নিরন্তর রয়েছি। বাল্যকাল থেকে অদ্যাবধি মাঝখানে কখনও, কোনও সময় আমি ছিলাম না—এরকম কিছু হয়েছে কি? নিজের সত্তা নিত্য-নিরন্তর অনুভূত হয় যে 'আমি আছি'। এই অভিজ্ঞতা সকলেরই। এই নিত্য-নিরন্তর অবস্থানকারী আমাদের সত্তার কখনওই ন্যূনতা আসে না। ন্যূনতা না হলে আমাদের ভিতর কি করে কামনার উদ্রেক হতে পারে? আমাদের ভিতর কামনার উদ্রেক তখনই হতে পারে যখন আমরা উৎপত্তি ও বিনাশশীল শরীরকে আমাদের সঙ্গে বলে মেনে নিই। যখন শরীর, পদার্থ, পরিবার প্রভৃতিকে নিজের সঙ্গে বলে মেনে নিই তখন তার মধ্যে ন্যূনতা দেখা দিলে আমাদের ভিতর কামনা আসে। সেজন্য শরীর, পরিবার, ধনসম্পদ, বৈভব প্রভৃতিকে নিজস্ব বলে মনে করবেন না; কেননা এই সবই পরিবর্তনশীল আর আমি চিরকালীন! বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, বার্ধক্য, রোগাক্রান্ত, নিরোগ—এইসব অবস্থাই বদলাতে থাকে, কিন্তু আমি সর্বদা যেমনকার তেমনই থেকে যাই।

শরীর বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও বদলে যাচ্ছি বলে আমরা মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বদলাই না। আপনার বাল্যাবস্থা শেষ হয়ে গিয়েছে,

তাহলে কি আপনিও শেষ হয়েছেন? 'আমি আছি'—এটির অবসান যেমন কখনও হয় না তেমনি ভগবানও কখনও শেষ হয়ে যান না। তিনি সর্বদা বর্তমান এবং চিরকাল থাকবেন। সাধুদের, শাস্ত্রের কথা থেকে জানা যায় যে 'সদা' তো শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ভগবান থাকবেন। কারণ হ'ল 'সদা' কালের নাম আর ভগবান কালকেও গ্রাস করেন—

ব্রহ্ম-অগনি তন বীচমেঁ, মথকর কাঢ়ে কোয়।
উলট কালকো খাত হৈ, হরিয়া গুরুগম হোয়।।
নবগ্রহ চৌঁসঠ জোগনী, বাবন বীর পর্জন্ত।
কাল ভক্ষ সবকো করে, হরি শরণে ডরপন্ত।।

তাৎপর্য হ'ল, কালও নষ্ট হয়ে যায় আর পরমাত্মা থাকেন।

'আমি আছি'—এখানে 'আছি'—ভাবটা শরীরকে নিয়ে। যদি শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে 'আছে'—ভাবটাই থাকবে। চারটি সম্বোধনের দ্বারা জগৎ-সংসারের সমস্তকিছুকে লক্ষ্য করানো যায়। যেমন আমি, তুমি (আপনি), এটি এবং ঐটি বা (সেইটি)। এর মধ্যে 'আছি' সম্বোধনটি কেবলমাত্র 'আমি' হলেই হবে অন্যথায় বাকি তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্য ক্ষেত্রেই 'আছে' হবে। 'আমি'-র সঙ্গে 'আছি' হয়—'**অস্মদ্যুত্তমঃ**'। যদি 'আমি'-কে সংযুক্ত না করি তবে 'আছে-ই থাকবে। এই 'আছে'-তে কখনও ন্যূনতা আসে না। কারণ সৎ-এর কখনও অবিদ্যমানতা হয় না—'**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (গীতা ২/১৬)। তা সদা-সর্বদা থাকে। সেই সদা-সর্বদা অবস্থানকারী পরমাত্মতত্ত্বতেই আমি আছি—এই কথাটিই আপনি মেনে নিন। এ ছাড়া আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না।

এটি খুবই ভুল ধারণা যে কিছু করলে তবেই পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে অতএব ভজন কর, জপ কর, সৎসঙ্গ কর, স্বাধ্যায় কর, ধ্যান কর, সমাধি প্রাপ্ত হও। এইরকম করার উপরে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। কথায় কিছু হবে না করলে হবে—এই ধারণা রক্তের মধ্যে মিশে আছে। কিন্তু আমি এ থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই যে 'আছে' রূপে যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্তা রয়েছে যাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না, তাতেই আমি রয়েছি। 'আমি' এবং ঐ 'আছে' একটিই। এটি ভালভাবে বোধগম্য হলে তখন আর করার কী বাকি থাকল? কী জানবার থাকল, পাবার কী থাকল, আমি সদা, সর্বদা পরমাত্মাতেই রয়েছি—এইটিই প্রকৃত আশ্রয়। সেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 'আছে' (পরমাত্মতত্ত্ব) থেকে কেউ আলাদা হতেই পারে না। সেই 'আছে'-কেই প্রাপ্ত করতে হবে

'নেই'-কে প্রাপ্ত করতে হবে না। 'নেই'-কে যদি প্রাপ্ত করা হয় তাহলে অস্তিমেও 'নেই'-ই থেকে যাবে। যা নেই তাকে প্রাপ্ত হলে তা থাকবে কি করে? এইজন্য 'আছে'-কেই প্রাপ্ত করতে হবে। আর সেই 'আছে'-র প্রাপ্তি সদা-সর্বদাই থাকে। আমরা তাতে রয়েছি এবং সেও আমাদের মধ্যেই রয়েছে।

এই অনুভূতি সকলেরই হয়েছে যে 'আমি আছি', শৈশবে যে আমি ছিলাম সেই আমিই আছি। অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, সময় বদলে গিয়েছে, সঙ্গীসাথী বদলে গিয়েছে, ভাব বদলে গিয়েছে, কিন্তু আপনি কি বদলেছেন? না আপনি বদলাননি। এইভাবেই সমস্ত সংসার বদলে যায়, কিন্তু পরমাত্মা বদলান না। আমরা সেই পরমাত্মার অংশ, সংসারের অংশ নই। সংসারের অংশ শরীরকে তো আমরা ('আমি' এবং 'আমার' মনে করে) ধরে রেখেছি। বাস্তবে তা আমাদের নয়, তা হ'ল সংসারের।

'আছি' তো 'আছে' থেকে দুর্বল (কমজোর)। কারণ হ'ল 'আছি' শরীরকে নিয়ে (একদেশীয়) রয়েছে আর শরীর তো দুর্বল (কমজোরী, একদেশীয়, পরিছিন্ন)। শরীরতো থাকবে না, কিন্তু আছে তো থাকবেই। 'আছে' (পরমাত্মা) হ'ল সমুদ্র আর 'আছি' হ'ল তার তরঙ্গ। তরঙ্গ শান্ত হয়ে গেলেও সমুদ্র তো থাকেই। সুতরাং আমাদের স্বরূপ 'আছে' থেকে অভিন্ন—এই কথাটি আপনি মেনে নিন। বুঝতে না পারলেও মেনে নিন। এইটুকু মেনে নিন যে আমি তাঁরই। এইরকম মেনে নিয়ে জপতপ, কীর্তন, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় করুন। আছি তো 'আছে'-রই।

'আছি' বদলায় আর 'আছে' বদলায় না—এই কথাটিই আমি বলতে চাই। এটি সার কথা। সনকাদি ঋষিদের এটিই জ্ঞান। ব্রহ্মাদিদেরও তাই। ব্যাসদেব, শুকদেব এঁদেরও এটিই জ্ঞান। যত সাধু-সন্ত হয়েছেন তাঁদেরও এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের পরে আর কিছু নেই। কৈবল্য জ্ঞানও এটি ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও মত ও মতান্তরে এর চেয়ে বড় আর কোনও জিনিস নেই, তা হবে না, হতে পারে না। এটি খুবই সরল এবং উঁচুদরের কথা। এটি এতই সহজ যে এটিকে প্রত্যেক ভাই-বোন, অল্প শিক্ষিত বেশী শিক্ষিত এবং একেবারেই লেখা-পড়া জানে না এমন লোকও বুঝতে পারে। এর চেয়ে বড় কথা আপনি আর কোথাও পাবেন না। এইভাবে বলছি এইজন্য যে আপনারা এটিকে মর্যাদা দিন। এটিকে গুরুত্ব দিন এই বলে যে আজ একটি বড় কথা পেয়ে গিয়েছি। উপনিষদে বলা হয়েছে যে অনেক লোক তো এমন কথা শুনতেও পান না—'শ্রবণায়াপি

বহুভির্য়ো ন লভ্যঃ' (কঠ. ১/২৭)। বয়স বেড়ে যায় কিন্তু শুনতে পাওয়া যায় না।

এখন আপনাদের আর একটি কথা বলব। আপনারা এখন যা মান্য করেন অর্থাৎ এই কথা শুনে আপনাদের যে ধারণা হ'ল ভবিষ্যতে যদি তা বজায় না থাকে তাতে এই মনে করে বিরত হবেন না যে এই কথা তো সবসময় আমার মনে থাকে না। আপনাদের নিজেদের নাম কি সবসময় মনে থাকে? সর্বদা মনে না থাকলেও যখনই লক্ষ্য করেন তখনই মনে হয় যে আমি অমুক নামধারী। এইভাবে এই কথা যদি সর্বদা মনে নাই থাকে তবু চিন্তা করামাত্র তা যদি মনে পড়ে যায় যে কথাটি তো তাই। তাতে প্রমাণ হয় যে কথাটি নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এটি ভুলে যাওয়া হয়নি। এটিকে তখনই ভুলে যাওয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে যখন আপনারা এই কথাটিকে রদ করে দেবেন আর বলবেন যে আমরা অমুক নামধারী নই। অতএব কখনও কথাটি স্মরণে না এলেও এটিকে ভুলে যাওয়া হয়নি, কিছুতেই না। কথাটিকে যদি রদ করে দিয়ে থাকেন তো অন্য কথা, নইলে আটপ্রহরে যদি একবারও স্মরণে না আসে তাহলেও কথাটি অর্থাৎ এ সম্বন্ধেআপনাদের ধারণা যেমনকার তেমনি থেকে যাবে। 'আছে' নাশ হবে কি করে? এত বড়, এত উঁচু এত পাকা কথা। যদি মেনে নেন তবে সংসার থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হবেন।

নারায়ণ। নারায়ণ। নারায়ণ।

নিজের অনুভূতিকে সম্মান

একটিখুবই সহজ সরল এবং সকলের অনুভূতিলব্ধ কথা। সেটিকে কেবল সম্মান করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে, সেটিকে মূল্যবান বলে মনে করতে হবে। নিজের টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, হিরে-পান্নাকে যেমন মূল্যবান বলে মনে করেন সেইরকমভাবে এই কথাটিকেও যদি মূল্য দেন, গুরুত্ব দেন তাহলে এই মুহূর্তে উদ্ধার হয়ে যাবেন। এটিকে গুরুত্ব দেন না বলেই বন্ধন থেকে যায়, আর কোনও কারণ নেই। টাকা-পয়সা কারও কাছে থাকে, কারও কাছে থাকে না, কিন্তু এই জিনিসটি সকলের কাছেই আছে। কেউই এ থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু এটিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় এটির অনুভূতি হয় না।

লালী লালী সব কহে, সবকে পল্লে লাল।
গাঁঠ খোল দেখে নহীঁ, তাতে ফিরে কঙ্গাল।।

সেই বাঁধন খোলার কথাই বলছি। সাধু-সন্তদের কাছে যা শুনেছি, বইতে পড়েছি সেই কথাই বলছি। সম্পূর্ণ সত্যি কথা। শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতি—এই তিনটি প্রমাণকে মুখ্য মনে করা হয়েছে। এখন আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তা শ্রুতি-(শাস্ত্র-) সম্মত, যুক্তি নির্ভর এবং অনুভূতিসিদ্ধ।

আপনারা নিজেদের মনে করেন যে 'আমি সে-ই' যা শৈশবে ছিলাম অর্থাৎ শৈশবে যা ছিলাম আজও তাই আছি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাই থাকব। শাস্ত্র, সন্ত এবং নিজ সংস্কৃতি অনুসারে আপনারা মনে করেন যে পূর্ব জন্মেও আপনারা ছিলেন এবং মৃত্যুর পর যদি আবার জন্মান তাহলেও আপনারা থাকবেন। শৈশবাবস্থাও এখন নেই এবং মৃত্যুর সময়ও এখন নয়; পূর্বের জন্মও এখন নেই এবং ভবিষ্যতের জন্মও এখন নেই। কিন্তু 'আমি এখন আছি'। তাৎপর্য হ'ল এই যে আমি সদা সর্বদা আছি এবং শরীর বদলে যায়। শরীর বদলে গেলেও আমি বিন্দুমাত্র বদলাই না। শরীর তো প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। একটি মুহূর্তও এমন নেই যখন তা বদলাচ্ছে না। কিন্তু এর মধ্যে অবস্থানকারী আমি (স্বরূপ) অনন্ত যুগ, অনন্ত ব্রহ্মা অতিবাহিত হলেও কখনও বদলাবে না। অতএব পরিবর্তনশীল শরীর এবং অপরিবর্তনীয় স্বয়ংকে জুড়বেন না, বরং ভিন্ন করে রাখবেন। ব্যাস, এইটুকুই শুধু কাজ। যখন এই দুটিকে মিলিয়ে দেখেন তখনই অজ্ঞান আর যখন এদের ভিন্ন করে দেখেন তখন জ্ঞান হয়ে যায়।

আপনারা জানেন যে শৈশবে আপনারা যা ছিলেন এখনও তাই আছেন। এই জ্ঞানকে শাস্ত্রীয় ভাষায় '**প্রত্যভিজ্ঞা**' বলা হয়। এই জ্ঞানকেই '**তত্ত্বমসি**'—'সেই (পরমাত্মা) তুমি' বলা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ কথাও এটি আর অত্যন্ত সাধারণ অনুভূতিও এটি। কেবল এই বিষয়ে দৃঢ় থাকতে হবে যে যা বদলাচ্ছে তা আমার স্বরূপ নয়। বৃত্তি বদলায়, অবস্থা বদলায়, ঘটনা, পরিস্থিতি, মানুষ, পদার্থ সব বদলে যায়, কিন্তু আমি পরিবর্তনশীল নই। আমি পরিবর্তনশীলকে দেখি। পরিবর্তনশীলকে সেই দেখে যে নিজে পরিবর্তনশীল নয়। এইজন্য আমি সর্বদা বিদ্যমান। আমার স্বরূপ কখনও বদলায় না আর শরীর কখনও স্থির থাকে না। আমি সেই-ই কিন্তু শরীর সেই-ই নয়। এইভাবে পরমাত্মা তিনিই, কিন্তু সংসার তা নয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি অনন্ত যুগে যিনি ছিলেন সেই পরমাত্মা আজও আছেন। অনন্ত যুগ বদলে যাবে তবু পরমাত্মা

তেমনই থাকবেন। অতএব আমি এবং (পরমাত্মা) এক আর শরীর এবং সংসার এক।

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।।

(মানস ৪/১১/২)

ভুল এটি হয়েছে যে শরীরকে সংসার থেকে ভিন্ন মনে করেছি,—'এটি তো আমি আর এটি আমি নয়' এবং নিজেকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন মনে করেছি—আমি তো এইখানে কিন্তু 'পরমাত্মা কী জানি কোথায় আছেন।' শরীর সংসার থেকে কখনও আলাদা হতেই পারে না। ব্রহ্মারও শরীরকে সংসার থেকে আলাদা করার শক্তি নেই। সংসার যে ধাতুতে সৃষ্টি, শরীরও সেই ধাতুতে সৃষ্টি। স্থূল শরীরের স্থূল-সংসারের সঙ্গেই ঐক্য আছে, সূক্ষ্ম-শরীরের সূক্ষ্ম-সংসারের সঙ্গে ঐক্য আছে, কারণ-শরীরের কারণ-সংসারের সঙ্গে একতা আছে। কিন্তু আমাদের একতা আছে পরমাত্মার সঙ্গে। আমরা পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫/৭)। পরমাত্মা এবং পরমাত্মার অংশ দুটি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না।

শরীরের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নেই, কিন্তু তার সঙ্গেই আমরা ঐক্য মেনে নিয়েছি অথচ পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের একতা রয়েছে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের একতা মানিনি—এটি কেবল ধারণা, মান্যতার ভেদ, অন্য কোনও ভেদ নয়। আমরা মান্যতাতে ভুল করেছি। শরীর বদলায়, কিন্তু আপনারা বদলান না। সংসার বদলায়, কিন্তু পরমাত্মা বদলান না। অতএব অপরিবর্তনীয় আমরা পরমাত্মার সঙ্গে এক এবং পরিবর্তনীয় শরীর সংসারের সঙ্গে এক—এই বোধ মানুষমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ। এটি কখনও নষ্ট হতে পারে না।

সংসারের এবং পরমাত্মার, আমাদের শরীরের এবং আমাদের স্বরূপের যে দ্বৈতভাব (ভিন্নতা) তা কখনও দূর হবে না। এটি চিরন্তন। কিন্তু মানুষ এটিকে সম্মান করে না, গুরুত্ব দেয় না। 'আমি শরীর থেকে ভিন্ন'—এই কথাটিকে সে সরিয়ে রেখেছে এবং 'এই শরীর আমি'—এই কথাটিকে ধরে রেখেছে। শরীরের সঙ্গে একতাকে আজ পর্যন্ত কেউ ধরে রাখতে পারেনি এবং তা পারবেও না। অতএব শরীর এবং সংসার এক আর আমি এবং পরমাত্মা এক। আমি এবং পরমাত্মা এক—এই বিষয়ে মতভেদ আছে। দ্বৈত-মতাবলম্বীরা পরমাত্মার সঙ্গে অন্তর্নিহিত আপনত্ব মেনে ঐক্য স্বীকার করেন আর অদ্বৈত মতাবলম্বীরা স্বরূপের সঙ্গে একতা মানেন। কিন্তু আমি এবং শরীর এক নয়—এই বিষয়ে কোনও মদভেদ নেই। শঙ্করাচার্য, বল্লভাচার্য,

রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি যত মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁরা দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদ্য-ভেদ প্রভৃতি নামে নিজেদের দর্শনে পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মেনেছেন। কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধের কথা কেউ মানেন নি। শরীর-সংসারের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নেই—এই বিষয়ে সব আচার্য, দার্শনিক, বিদ্বান একমত। যে বিষয়ে সকলে একমত সেই কথাটিকে আপনারা মেনে নিন। আমরা শরীর-সংসারের সঙ্গে এক নই। আমাদের একত্ব পরমাত্মার সঙ্গে এটিই হ'ল জ্ঞান। এই জ্ঞানকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখুন—এতে বাধা কোথায়?

শরীরের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার জন্য আমরা শরীরের সুখকে নিজেদের সুখ বলে মনে করি। শরীরের সম্মান হলে আমরা নিজেদের সম্মান বলে মনে করি। শরীরের বড়াই হলে আমরা নিজেদের বড়াই মনে করি। শরীরের অনাদর হলে নিজেদের অনাদর মনে করি। শরীরের অপমানে আমরা নিজেদের অপমান বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে শরীরকে কেউ যদি পিষেও ফেলে তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না। একদিন তো লোকেরা এই শরীরকে জ্বালিয়ে দেবে, কিন্তু আমাদের একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না। আমাদের স্বরূপের সামান্য অংশও জ্বলবে না, নাশ হবে না। সুতরাং সংসার যদি আমাদের নিরাদর করে, অপমান করে, নিন্দা করে, দুঃখ দেয়, শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেয় তো তাতে কী হবে? গীতায় আছে—**'যস্মিন্‌স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'** (৬/২২)। অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ আত্যন্তিক সুখে অবস্থিত মানুষকে ভীষণ দুঃখও বিচলিত করতে পারে না। কোনও কারণে তার অঙ্গচ্ছেদ যদি করা হয় তাহলেও সে নিজের স্বরূপ থেকে বিচলিত হয় না, মহান আনন্দ থেকে চালিত হয় না। হ্যাঁ, শরীরে যন্ত্রণা হতে পারে, মূর্ছিত হতে পারে, কিন্তু সে দুঃখিত হয় না। সাংসারিক বস্তু থেকে এত সুখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি এবং আমার শরীর আলাদা—এই কথাটিকে অনাদর এবং শরীরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে শরীরের দুঃখকে নিজেদের দুঃখ এবং সুখকে নিজেদের সুখ মনে করা—দয়া করে এমন কাজটি করবেন না।

শ্রোতা—শরীরকে তো প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে অস্বীকার কি করে করব?

স্বামীজী—প্রত্যক্ষ হয় তো হোক, তাকে মেনে নেবেন না। দর্পণে নিজের মুখ তো প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই বলে দর্পণের সেই মুখকে কি আপনি মেনে নেন? মানেন না। দর্পণে যে মুখ দেখা যায় তাকে কি আপনি ধরতে পারেন? ধরতে

পারেন না। অতএব যা প্রত্যক্ষ হয় তাকেই মানবেন না। আমি শরীর—এটি হ'ল দর্পণে দেখা ঐ মুখের মতো, প্রকৃতপক্ষে নেই। যদি আপনি এবং আপনার শরীর এক হতো তাহলে শরীর আপনাকে ছেড়ে যেতে পারত না আর আপনি শরীরকে ছেড়ে যেতে পারতেন না। কিন্তু মৃত্যু হলে শরীর চলে যায় আর আপনিও শরীরকে ছেড়ে দেন। আপনি আর আপনার শরীর এক নয়। যেমন, আমি বাড়িতে বসে আছি, তো আমি ছাড়াও এই বাড়ি থাকে এবং এই বাড়ি ছাড়াও আমি আছি। অতএব আমি এবং বাড়ি এক নয়। মৃত মানুষ ও পশুদের দেখা যায় যে তাদের শরীর এখানে পড়ে আছে, কিন্তু সেগুলিতে অবস্থানকারী জীবাত্মা চলে গিয়েছে। তারা যে এখনই আলাদা হয়েছে তা নয়। তারা প্রথম থেকেই আলাদা ছিল। জীবাত্মা আর শরীর যদি এক হোত তাহলে জীবাত্মার সঙ্গে শরীরও চলে যেত অথবা শরীরের সঙ্গে জীবাত্মাও এখানে থেকে চলে যেত। কিন্তু না জীবাত্মার সঙ্গে শরীর থাকে আর না শরীরের সঙ্গে জীবাত্মা থাকে। অতএব শরীর এবং জীবাত্মা দুটি আলাদা, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই দুটিকে আলাদা জানাই হ'ল জ্ঞান, এর বর্ণনা ভগবান গীতায় প্রারম্ভে করেছেন। (২/১১-৩০)। উপদেশ দেবার শুরুতেই ভগবান জানিয়েছেন যে শরীর এবং শরীরী, দেহ এবং দেহী—এই দুটি আলাদা। শরীর সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু শরীরী কখনও বদলায় না, বিনষ্ট হয় না। এই কথা জানার পর শোক হতেই পারে না; কেননা যা বিনাশশীল তার নাশ তো হবেই, তাতে শোকের কী আছে? আর যা অবিনাশী তা সর্বদা অবিনাশী থাকবে তাতে শোক কিসের?

যেমন আপনারা নিজেদের শরীরস্থ বলে মনে করেন সেইরকমই পরমাত্মা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছেন। সমগ্র জগতে থেকেও জগতের সঙ্গে পরমাত্মার কোনও সম্পর্ক নেই। সারা জগৎ ওলট-পালট হয়ে গেলেও পরমাত্মার তাতে কিছু যায় আসে না। তেমনি আপনাদের শরীরও যদি ওলট-পালট হয়ে যায় তাতে আপনাদের কিছু যায় আসে না। আপনারা যেমন তেমনই থেকে যান। আপনারা গুণাবলিকে আপন মনে করেছেন, শরীরের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ জুড়েছেন সেইজন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩/২১)। গুণাবলির সঙ্গ ছাড়লে জন্ম-মৃত্যুর অস্তিত্বই থাকে না। গুণগুলির সঙ্গ আপনারা মেনেছেন। অতএব সঙ্গ না মানলে সেই সম্পর্ক দূর হয়ে যাবে।

এটি সোজা এবং সত্য কথা যে আপনারা সদাসর্বদা থাকেন এবং শরীর একমুহূর্তও স্থির থাকে না, সর্বদা বদলাতে থাকে। এ-কথা শুনতে ভাল লাগে, সত্য বলেই মনে হয়, তবু এই কথা টেঁকে না—এরকম মনে করবেন না। এই কথা কখনও এদিক-ওদিক হয় না। অনন্ত কাল থেকে এই কথা (সত্য) একইরকম রয়েছে, তাহলে এখন তা চলে যাবে কেমন করে? আগে এই কথার প্রতি খেয়াল হয়নি, এখন হয়েছে—এইটুকুই কেবল পার্থক্য। এই কথা (সত্য) আগে চলে যায়নি, এখনও যাবে না। এটি সর্বদা এইরকমই থাকবে। ভুলে গেলেও একই থাকবে এবং অনুভূতি না হলেও একইরকম থাকবে। যেমন, এখন এই থামটি দেখা যাচ্ছে। যদি বাইরে যান তাহলে থামটি দেখতে পাবেন না। তাহলে কি থামটি নেই? যে কথা যথার্থ তা যেমনকার তেমনই থেকে যাবে।

শ্রোতা—তাহলে কোন্‌টি বাধা?

স্বামীজী—অপরের কাছ থেকে সুখ নেন—এটিই একমাত্র বাধা। এখন অপরকে সুখ দিতে শুরু করুন। এতদিন তো সুখ আহরণ করে এসেছেন এবার তা দিতে শুরু করুন। ব্যাস সব দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

আমি টাকা পয়সা পাব, আমার আরাম হবে, আমার সুখ হবে, সম্মান হবে, প্রসিদ্ধি হবে—এগুলি হ'ল বিরাট বাধা এবং এ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান সব পেয়ে গেলেও সেগুলি টিকবে না। আর যদি টিকেও যায় তাহলেও আপনাদের শরীর টিকবে না। কেবল ক্ষতি ছাড়া এক চুলও লাভ হবে না। এত ক্ষতিও যদি না ছাড়েন তাহলে কী ছাড়বেন?

সংসারে সুখ পাবার যে কামনা সেইটিই বাধা। ধন, মান, সুখভোগ, জমি, বাড়ি প্রভৃতির জন্য নানারকমের কামনা আছে, কিন্তু মূলে কামনা এইটিই, আমার মনের কথা যেন পূর্ণ হয়। আমি যেমনটি চাই তেমনটি যেন হয়ে যায়। যদি তার বদলে এই ভাবনা জাগে যে আমার মনের মতো না হয়ে ভগবানের মনের মতো হোক অথবা সংসারের মনের মতো হোক তাহলে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই। ভগবানের মনের কথা পূর্ণ হোক—এ হ'ল ভক্তিযোগ। সংসারের মনের কথা পূর্ণ হোক—এ হ'ল কর্মযোগ। আমার মনের কথাই নেই, মনই আমার নেই, এতো প্রকৃতির—এ হ'ল জ্ঞানযোগ।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

ভগবৎ প্রাপ্তি—কর্মসাধ্য নয়

একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। সেটি হ'ল যাকে মুক্তি, কল্যাণ অথবা ভগবৎ প্রাপ্তি বলা হয় তা স্বতঃসিদ্ধ, তা কর্মের দ্বারা সিদ্ধ হবার নয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। আপনারা দয়া করে এই কথাটিতে মনোনিবেশ করুন। পৃথিবীতে যত জিনিস আছে সেগুলি সবই প্রকৃতির কাজ হওয়ায় সেগুলিতে সবসময় পরিবর্তন হতে থাকে। ঐ বস্তুগুলি ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেগুলির প্রাপ্তি কর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে। সেজন্য পৃথিবীর সকল বস্তু কর্মসাধ্য। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব সবসময় যেমনকার তেমনই থাকে, তাতে কোনও পরিবর্তন হয় না। সেজন্য পরমাত্মতত্ত্ব কর্মসাধ্য নয়। একটি অতি শ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তা কর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য নয়। এই কথাটিতে বিশেষ করে মনোযোগ দিতে হবে। আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বলছি যে আমি এটি অনেক বছর পরে সাধুদের কাছ থেকে পেয়েছি। এই কথাটি সর্বশাস্ত্রসম্মতও। তাই আপনারা যদি কেবল এই কথাটিতে মন দেন তাহলে খুবই লাভবান হবেন। এইবার সোজাসুজি বলছি। আপনারা মন দিন।

আমরা এই কথাটি স্বীকার করি যে পরমাত্মা সবসময়, সব জায়গায়, সকলের মধ্যে এবং সকলের হয়ে আছেন। এখন এই চারটি বিষয় চিন্তা করুন—(১) পরমাত্মা যখন সবসময়ে আছেন তাহলে তিনি এখন আছেন, না নেই? যদি এখন না থাকেন তাহলে পরমাত্মা সবসময় আছেন, একথা তো টিকবে না। (২) পরমাত্মা যদি সব জায়গায় থাকেন তাহলে এখানে আছেন, না নেই? যদি এখানে না থাকেন তাহলে তিনি সব জায়গায় আছেন, একথাও টিকবে না। (৩) পরমাত্মা সকলের মধ্যে আছেন। তিনি জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সবেতেই আছেন। সজীবের মধ্যে দুটি ভিন্নতা আছে—স্থাবর এবং জঙ্গম। বৃক্ষাদি স্থাবর এবং মানুষ, পশু, পাখি প্রভৃতি জঙ্গম। জড়-চেতনে, স্থাবর-জঙ্গমে পরমাত্মা আছেন। নিম্নতম বলে মনে করা হয় যেসব প্রাণীকে এবং ঘৃণ্যতম আচরণ করে যেসব মানুষ তাদের মধ্যেও পরমাত্মা আছেন। সাধু-সন্তদের মধ্যেও পরমাত্মা আছেন। শুদ্ধতম বস্তুতে এবং অত্যন্ত অপবিত্র বস্তুতেও পরমাত্মা আছেন। নরকেও পরমাত্মা পরিপূর্ণ। তিনি যখন সকলের মধ্যেই আছেন তো আমাদের মধ্যে কি নেই? যদি আমাদের মধ্যে না থাকেন তাহলে তিনি সকলের মধ্যে আছেন এই কথা টিকবে না। (৪) পরমাত্মা

সকলের। এমন কথা নয় যে তিনি সাধুদের, গৃহস্থদের জন্য নয়; ছেলেদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়; ব্রাহ্মণদের জন্য, অন্তজের জন্য নয়। একথা আপনারা বলতে পারেন না যে পরমাত্মা কোনও ব্যক্তি বিশেষের। পরমাত্মা সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের কাছে ঠিক তেমনভাবেই আছেন যেমনভাবে তিনি আছেন মহত্তম ব্যক্তির কাছে। পরমাত্মার উপর মহত্তম ব্যক্তির যতটা অধিকার দুষ্টতম ব্যক্তির ঠিক ততটাই অধিকার। তাঁর কারও প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্ব থাকতেই পারে না। সে তো অসম্ভব। অতএব পরমাত্মা যখন সকলের তখন তিনি আমাদেরও। যদি তিনি আমাদের না হন তাহলে তিনি সকলের একথা বলা যাবে না। তাহলে কী প্রমাণিত হ'ল? তা হ'ল, পরমাত্মা যখন সর্বসময়ে আছেন তাহেল তিনি এখনও রয়েছেন, যখন তিনি সর্বত্র বিদ্যমান তখন তিনি এখানেও রয়েছেন আর সকলের মধ্যেই যখন আছেন তখন আমার মধ্যেও আছেন এবং তিনি যখন সকলের তখন আমারও।

উপরোক্ত চারটি কথার দিকে মনোনিবেশ করলে এই কথাটি প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা আমাদের কাছে নিত্যপ্রাপ্ত। আমরা ভগবানের ভজনা করি, নামজপ করি, কীর্তন করি, রামায়ণ, ভাগবতাদি গ্রন্থ পড়ি, সাধুসন্তদের বাণী পাঠ করি এই ভাবনা নিয়ে যে পরমাত্মাকে পরে পাওয়া যাবে। এখন আমরা পরমাত্মাকে লাভ করবার যোগ্য হইনি, এইজন্য এখন পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে না, ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। এই ধারণা সাধকের কাছে প্রচণ্ড বাধা। তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন কিন্তু বাস্তবে ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার উদ্যোগই তাঁরা করেন। এই চিন্তা করেন যে এখন ভগবানকে পাওয়া যাবে না; যখন চিত্ত শুদ্ধি হবে, তখন ভগবানকে পাওয়া যাবে। এখন কি করে পাওয়া যাবে? আমি যোগ্য নই, উপযুক্ত পাত্রও নই। সাধকের পক্ষে এইরকম ধারণা খুবই ক্ষতিকারক। চিন্তা করা উচিত যে আমাদের অপাত্রতায় ভগবান কি আটকে যেতে পারেন? ভগবান কি এতই দুর্বল যে আমরা অযোগ্য বলে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না? যদি তা হয় তাহলে তাঁকে দয়ালু বলা নিরর্থক। যদি তিনি যোগ্যর সঙ্গেই কেবল মিলিত হন, অযোগ্যর সঙ্গে মিলিত না হন তাহলে দয়া আর কি হ'ল?

ভগবান নিজেকে প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ বলেছেন—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫/২৯), তাহলে দুষ্টতম মানুষেরও কি ভগবান সুহৃদ নন? আমি

যেমনই হই না কেন ভগবান কি আমার সুহৃদ নন? তাঁর মধ্যে যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহলে আর তিনি ভগবান কি করে হলেন? আমি দুষ্ট, খুবই অযোগ্য, তাই আমার উপর ভগবানের কৃপা বেশি হবে—

পাপী হুলস বিশেষী অবকী বের উবারিয়ো।

(করুণাসাগর)

পাপীর মনে বেশি আনন্দ থাকে, কেননা ভগবান হলেন পতিতপাবন। এজন্য তাঁর উপর পতিতদের অধিকার বেশি। মাও তাঁর অযোগ্য ছেলের দিকে বেশি মন দেন। তাহলে ভগবান কি আমার দিকে বেশি দৃষ্টি দেবেন না? ভগবান আমায় কৃপা করবেন না—এ তো হতেই পারে না। তাই ভজন-ধ্যান করলেও, নামজপ করলেও এই কথার উপর বিশেষ জোর দিন যে জিহ্বার নামে, শ্বাসে, মনে, বুদ্ধিতে, অন্তঃকরণে শরীরে সর্বত্র পরমাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তিনি সকলের মধ্যে কাণায় কাণায় ভরা। এখন এই সংশয় উত্থিত হয় যে যখন পরমাত্মা সকলের মধ্যে আছেন, সর্বত্র বিদ্যমান তাহলে আবার নামজপ কেন করি? নামজপ না করলে আমাদের সন্তোষ হয় না বলেই আমরা তা করি। সনকাদি ঋষির কথা আপনারা শুনে থাকবেন। তাঁরা চার ভাই সমান ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের একজন ভগবানের কথা শোনান আর বাকি তিনজন শোনেন। এইরকম ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের কথা বলে যান, কেননা ভগবানের আকর্ষণই এমন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

(শ্রীমদ্ভা. ১/৭/১০)

'জ্ঞানের দ্বারা যাঁদের চিৎ-জড় গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে এ সেই আত্মারাম মুনিরা ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করে থাকেন। কেননা ভগবানের গুণই হ'ল এমন যে প্রাণীদের তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।'

ভগবান এমনই যে সাধকরা তাঁর ভজনা না করে থাকতে পারেন না। এত রস, এত আনন্দ কোথাও নেই, কোথাও হয়নি, হবে না, হতে পারেই না। এই জন্যই আমরা তাঁর ভজনা করি। ভজনার দ্বারা আমরা ভগবানকে কিনে নে এমন ভাবনা রাখবেন না। ভগবান আপন কৃপাতেই উপস্থিত হন। ভজন ধ্যান, নামজপ, কীর্তন প্রভৃতিতে আমাদের অনন্য প্রেম থাকা চাই। কেনন আমরা সংসারের প্রতি আসক্তি, প্রিয়তা করে বড়ই ভুল করেছি। এখন এ

ভুল সংশোধনের জন্য ভজন-ধ্যান, নামজপ প্রভৃতি করি। ভগবান ভজন-ধ্যানের অধীন, এমন কথা নয়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

(গীতা ১১/৫৩)

অর্থাৎ আমাকে বেদাধ্যয়ন, তপ, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না। উপনিষদে বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

(কঠ. ১/২/২৩)

অর্থাৎ প্রবচনের দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা, অনেক শাস্ত্রের জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এর বিপরীত অর্থ আপনারা যেন এই করবেন না যে সৎসঙ্গ করা, পড়া, শাস্ত্রের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া খারাপ জিনিস। এগুলি তো করতে হবেই। বলার অর্থ হ'ল যে এগুলির দ্বারা ভগবানকে কব্জা করতে পারবেন না, তাঁর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। যেমন, কোনও জিনিসের দাম চুকিয়ে দিলে সেই জিনিসের উপর আমাদের অধিকার হয়ে যায়। কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ জিনিস চলে না। সাধনা করে ভগবানের উপর অধিকার সৃষ্টি করা যায় না। তাঁর উপর অধিকার সৃষ্টি করারও একটি পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি হ'ল সর্বতোভাবে ভগবানেরই হয়ে যাওয়া। তন, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি, অধিকার প্রভৃতি কোনও কিছুর বিন্দুমাত্র আশ্রয় না রেখে কেবল ভগবানেরই হয়ে গেলে ভগবান তার বশে এসে যাবেন। কিন্তু আমরা সাধনা করলাম, জপ করলাম, আমরা কীর্তন করলাম, অভ্যাস করলাম, আমরা গীতা জানি, অনেক শাস্ত্র জানি এইরকম নিজেকে যোগ্য মনে করে যে ভগবান বশে এসে যাবেন তা অসম্ভব। ভগবান যদি বশীভূত হন তাহলে তা কৃপা করেই হয়ে থাকেন। তাঁর কৃপা তাদের উপরেই হয় যারা সর্বতোভাবে তাঁর হয়ে যায়। তিনি যদি সুলভ হন তো এতই যে 'হে নাথ! আমি আপনার'—এই কথা শোনামাত্র ভগবান বলবেন, 'হ্যাঁ পুত্র! আমি তোমার।' আপনি যতই বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ্যতা আদি সংগ্রহ করুন, তাতে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধিপেতেপারে, আপনার মধ্যে পবিত্রতা আসতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা ভগবান বশীভূত হবেন এমন কথা নয়।

ভগবান আমাদের এবং আমরা ভগবানের, এইটিই হ'ল সত্য কথা। এইজন্য ভজন-ধ্যান করার সময় এই কথাটি বিশেষ করে মনে রাখবেন যে ভগবান এখন রয়েছেন, এখানে রয়েছেন, আমার মধ্যে আছেন এবং আমার

হয়ে আছেন। এখন নিরাশার স্থান কোথায়? যেমন শিশু মনে করে যে মা তার, তাই মায়ের ওপর সে তার অধিকার মেনে নেয়। মা এদিক-ওদিক দেখলে সে মায়ের চিবুক ধরে বলে 'তুমি আমার দিকেই দেখ'। তখন মাকে তার দিকেই দেখতে হয়। এইভাবেই আমরা ভগবানকে বলব যে আমরা তোমার, তুমি আমাদের, তাই আমাদের দিকেই তুমি তাকাও। সন্তেরা বলেছেন—'ন ম্যায় দেখূঁ ঔর কো, ন তোহি দেখন দেউঁ।' আমি অন্য কাউকে দেখব না আর তোমাকেও অন্য দিকে দেখতে দেব না। এমন হলেই ভগবান বশে এসে যাবেন। আমরা যে অন্য দিকে দেখি সেইটিই বাধা।

এক বানি করুনানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী।।

(মানস ৩/১০/৪)

এইজন্য মানুষ যেমনই হোক না কেন ভগবানের প্রতি তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনি জপ করুন, কীর্তন করুন, সবকিছুই করুন। আর বিশ্বাস যদি হয় তাহলেও সবকিছু করুন। কেননা এইগুলি তো করবারই কথা। কিন্তু জপ-ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা ভগবানকে কব্জা করে নেবেন এমন কথা নয়। আমরা তাঁর কাছে নিজেদের দিয়ে তবেই তাঁকে কব্জা করতে পারি। আমরা নিজেদের সংসারকে দিয়ে রেখেছি। তাই দুঃখ পাই। আমরা যদি নিজেদের ভগবানকে দিয়ে দিই তাহলে আমরা সফলকাম হব।

প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত কথা হ'ল কর্মের দ্বারা ভগবানকে কব্জা করা যায় না। যতই অধিকার প্রাপ্ত করুন না কেন তাঁর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। কারণ এগুলির দ্বারা তাকেই অধিকার করা যায় যে ঐগুলি থেকে কমজোর। একশ টাকায় আমরা সেই জিনিসই অধিকার করতে পারি যার মূল্য একশ টাকার চেয়ে কম। কোনও জিনিস যদি একশ টাকার হয় তাহলে একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে তা আমরা অধিকার করতে পারি। অনুরূপভাবে ভগবানকে যদি কোনও যোগ্যতার বিনিময়ে কিনতে চান তাহলে সেই যোগ্যতার চেয়ে দুর্বল ভগবানই পাবেন। অতএব ইনি অনাসক্ত, ইনি ত্যাগী, ইনি বড়—ইনিই ভগবানকে পাবেন, আমরা পাব না এমন ধারণা একেবারেই ভুল। যদি আপনারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে যান, তাঁকে ছাড়া থাকতে না পারেন তাহলে বড় বড় পণ্ডিত এবং অনাসক্তেরা কাঁদতে থাকবেন; আপনারাই প্রথমে ভগবানকে পাবেন। আপনারা যদি ভগবানকে ছাড়া থাকতে না পারেন তাহলে ভগবানও আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারবেন না। এইজন্য ভগবানের

জন্য কারও বিন্দুমাত্র নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সংসারের কাছে আশা রাখার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কারণ হ'ল কেবল আশার দ্বারা সংসারকে পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও তা টিকবে না। আর যদি এ টিকেও যায় আপনাদের শরীর টিকবে না। সংসার অভাবরূপ, সেজন্য তার অভাব সর্বদাই থেকে যাবে। পরমাত্মা ভাবরূপ, সেজন্য তাঁর ভাব সবসময় থাকবে, কখনও অভাব হবেই না। এইটিই হ'ল সিদ্ধান্ত।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমাত্মা-প্রাপ্তির সহজলভ্যতা

আমি যে কথা বলি তা দয়া করে আপনারা মেনে নিন। আমি এমন কথা বলি যা আপনাদের জানা। কোনও নতুন কথা আমি বলি না। কোনও ভাই-বোন কি জানেন যে তিনি আগে ছিলেন না এবং পরেও থাকবেন না? এই প্রশ্ন স্বয়ং-এর সম্পর্কে, শরীরের সম্পর্কে নয়। শরীর তো জন্ম হবার আগে ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও থাকবে না। কিন্তু আমি আগে ছিলাম না এবং ভবিষ্যতে থাকব না আর এখনও নেই—এইরকম নিজের সম্পর্কে অভাবের অনুভূতি কি কখনও কারও হয়ে থাকে? নিজের সম্পর্কে অভাবের অনুভূতি কারও কখনও হয় না। আমি কী ছিলাম, কী হব এবং বর্তমানে কী, এমন চিন্তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু আমি আছি, না নেই—এমন চিন্তা, এমন সংশয় কখনও হয় না।

'আমি আছি'—এই যে আপন সত্তা, স্বয়ং-এর অধিষ্ঠান এর কখনও বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২/১৬) যার কখনও অবিদ্যমানতা (ঘাটতি) হয় না, তাতে কখনও ন্যূনতা হয় না। যার কোনও ন্যূনতা হয় না, তার জন্য কী প্রয়োজন? কিছুই চাই না। কারণ কম থাকলে তবেই তো প্রয়োজন হয়। যার কোনও অবিদ্যমানতা নেই, যার মধ্যে কোনও ন্যূনতা নেই, যা নিত্য-নিরন্তর যেমনকার তেমনই থাকে তার জন্য কী আর করবার বাকি থাকে? জানবার কী বাকি থাকে? পাওয়ার কী থাকে? কিন্তু সেই সদা বিদ্যমান-এ স্থিত না হয়ে যা প্রতিক্ষণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই শরীরে যদি আপনারা স্থিত হয়ে যান তাহলে করাও বাকি থাকে, জানাও বাকি থাকে এবং পাওয়াও বাকি থেকে যায়।

এই কথাও আপনারা জানেন যে শরীর প্রতিমুহূর্তে বদলায়, কখনও এক অবস্থায় থাকে না। যদি শরীর একই অবস্থায় থাকত তাহলে শৈশবের শরীর এখনও বজায় থাকত। কিন্তু শৈশবের শরীর এখন নেই—এই অভিজ্ঞতা সকলেরই। শৈশবের শরীর কোনও একদিনে, এক মাসে অথবা এক বছরে বদলায় নি। কিন্তু প্রত্যেক বছরে, মাসে, দিনে, ঘণ্টায়, মিনিটে এবং প্রতি সেকেণ্ডে তা বদলে যায়। অতএব কেবল পরিবর্তনের সমূহের নামই হ'ল শরীর। শরীরাদি বস্তুকে স্থূল বুদ্ধিতে দেখা হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে দেখলে কেবল পবিবর্তনকেই দেখা যাবে, বস্তুকে দেখা যাবে না। যেমন, পাখা যখন চলে তখন গোল আবর্তনকেই দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবে তা তো গোল আবর্তন নয়। পাখার ব্লেডগুলি আলাদা, কিন্তু জোরে ঘোরার জন্য গোল আবর্তন দেখায়। এইভাবে দ্রুত পরিবর্তনের জন্য পদার্থ, শরীর প্রভৃতিকে দেখা যায়। এটি শরীর—এই কথা বলতে তো সময় লাগে, কিন্তু এর পরিবর্তনে সময় লাগে না। এতো সবসময় বদলাতেই থাকে। কিন্তু স্বয়ং (স্বরূপ) নিরন্তর যেমনকার তেমনই থাকে। নিত্য বিদ্যমান স্বয়ংকে যখন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি তখন কামনা, ইচ্ছা, বাসনা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। তাতেই সমস্ত অনর্থ হয়ে থাকে।

যদি আমরা নিত্য অবস্থানকারী না হতাম তাহলে পূর্বে কৃতকর্মের ফল এখন এবং এখন কৃতকর্মের ফল ভবিষ্যতে কাকে ভোগ করতে হবে? আমরা পূর্বে ছিলাম, তবেই না পূর্বে কৃত ফলের ভোগ এখন ভোগ করছি; এবং আমরা ভবিষ্যতে থাকব বলেই তো এখনকার কৃত ফলের ভোগ আমাদের ভবিষ্যতে করতে হবে। পূর্বে আমরা যা কর্ম করেছি তা পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমরা করেছি এবং এখন তার ফলও পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভোগ করছি। এখন শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে কর্ম করছি তার ফলও শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভোগ করব। আমরা যদি শরীরের সঙ্গে যুক্ত না হই তাহলে না পূর্বে কৃত কর্ম আমাদের স্পর্শ করবে, না এখনকার কর্ম স্পর্শ করবে এবং না ভবিষ্যতের কর্ম স্পর্শ করবে। কারণ হ'ল যা অস্তি তার কখনও অবিদ্যমানতা হয় না আর নাস্তি না হলে অন্য বস্তুর স্পর্শ হয় না, প্রভাব পড়ে না। ঐ 'অস্তি' সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকে। এইজন্য অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলেছেন—

হ্যায় সো সুন্দর হ্যায় সদা, নহিঁ সো সুন্দর নাহিঁ।
নহিঁ সো পরগট দেখিয়ে, হ্যায় সো দীখে নাহিঁ।।

'অস্তি' তো সকলের দ্রষ্টা, তাকে কি করে দেখা যাবে? চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা হয় কিন্তু চোখকে দেখা যায় না কিন্তু যার দ্বারা দেখা যায় সেটি হ'ল চোখ। এইভাবে আমরা অস্তিকে অর্থাৎ আপনার নিজত্বকে দেখতে পারি না। কিন্তু যার দ্বারা এ সবকিছু দেখা যাচ্ছে সেইটিই হ'ল 'অস্তি'। এই কথাটি আপনারা মেনে নিন। আপনারা বলতে পারেন যে আপনারা তা অনুভব করতে পারছেন না। অতএব তার অনুভূতির জন্য আপনারা প্রশ্ন করুন, তার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান।

আপনারা দয়া করে এটি মনে করবেন না যে সেই 'অস্তি' দূরাবস্থিত, সে আসবে অথবা আমরা তার কাছে যাব তবেই আমাদের মিলন হবে। নইলে ভজন করবার সময় আপনারা তো মনে করেন যে আপনারা ভগবানের সন্নিকটবর্তী হচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে আপনারা নিজেদের ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন, ভগবানের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধের যে অভাব তাকেই দৃঢ় করছেন। ভগবানকে পরে পাওয়া যাবে, এখন নয়—এমন ধারণা রেখে ভগবানের নাম জপ করেন। দয়া করে এই ধারণাটা ত্যাগ করুন। আমাদের অনুভূতি হচ্ছে না—এমন কথা যদি মনে হয় তো তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিন যে ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান। 'আমি আছি'—এতেও ভগবান, মনেতেও ভগবান, বুদ্ধিতেও ভগবান এবং বাণীতেও ভগবান। রাম-রাম-রাম এই ধ্বনিতেও ভগবান। দেখায়, শোনায়, বোঝায় যা কিছু রয়েছে সবই ভগবান। ভগবান বলেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা।।

(শ্রীমদ্ভাঃ ১১/১৩/২৪)

মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, দৃষ্টির দ্বারা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়—তা সবই আমি। আমি ভিন্ন আর কিছুই নেই—এই সিদ্ধান্ত আপনারা তত্ত্ব বিচারের দ্বারা বুঝে নিন।

অতএব 'ভগবান আছেন' এইটিই আপনারা মেনে নিন, এখনই যদি সেই অনুভূতি নাই হয়। সাধু-সন্তরা বলেন, বেদ-পুরাণ বলেন, বড় বড় জ্ঞানীরা বলেন যে 'তিনি আছেন।' 'তিনি আছেন'—কেবল এই কথাটুকু মেনে নিয়ে আপনারা একাগ্রতার সঙ্গে যদি রাম নাম জপ করতে থাকেন তাহলে খুব তাড়াতাড়িই এই অনুভূতি এসে যাবে। কি করে সেই অনুভূতি হবে? কী করব? কেমন করে করব? কাকে জিজ্ঞাসা করব?—এই আকুতি যেন

জোরদার হয়। রাম নাম ত্যাগ করবেন না, কেননা এছাড়া সংসারে আর কোনও সহায় নেই। মরে গেলেও বলা হয় 'রাম নাম সত্য হ্যায়'। শরীর-সংসার অবিদ্যমান্। অতএব রাম-রাম করতে থাকুন। 'র'-তে, 'আ'-তে, 'ম'-তে, জিভে, মনে, স্ফুরণে, চিন্তনে, বুদ্ধিতে নিজস্বতায় সর্বত্র সেই পরমাত্মা পরিপূর্ণ রয়েছেন। যিনি সর্বত্র রমণ করেন আর যাঁর মধ্যে সকলেই অবস্থান করেন, তাঁরই নাম রাম।

রাম নাম জপ করা খুবই মহান এবং সহজ সাধন। গতকাল বাত রোগগ্রস্ত একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যে 'রাম রাম' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছিল না। রাম নাম ইহলোকে, পরলোকে সর্বত্র শান্তিদায়ক, সকলের সুখ প্রদানকারী।

সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহূ। লোক লাহূ পরলোক নিবাহূ।।

(মানস ১/২০/১)

ভগবান সর্বত্র আছেন, যেখানে আপনারা আছেন তিনিও সেইখানে আছেন এই কথাটি আপনারা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, যুক্তি দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে অথবা ভাবনা চিন্তা করে যেভাবেই হোক মেনে নিন। আপনাদের ঐক্য পরমাত্মার সঙ্গে রয়েছে, পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে নয়। শাস্ত্রও সুস্পষ্ট ভাষায় জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে যে পরমাত্মা সর্বত্র আছেন, সকলের মধ্যে আছেন, তিনি সকলের আপন, সকলের সুহৃদ। আপনারা দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিন। সাধকদের এই ভুলটি খুব হয় যে তাঁরা মনে করেন যে 'ভজন' করে তাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করবেন। ভবিষ্যতের এই আশাটি বড় বাধা। শাস্ত্রের দ্বারা, সাধুদের কথায় কিংবা যার কথায় আপনার বিশ্বাস জন্মে এমন কারও কথায় এটি মেনে নিন যে পরমাত্মা প্রাপ্ত রয়েছেন, কেবল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমানে পরমাত্মার অভাব স্বীকার করবেন না। আপনারা তাঁকে অনুভব করতে পারছেন না; অতএব কি করে অনুভূতি হয়ে তার জন্য দিন রাত রাম রাম জপ শুরু করে দিন। এতে অলৌকিকতা বুঝতে পারবেন, দেখবেন কত তাড়াতাড়ি অনুভূতি এসে যাবে।

জো জিব চাহে মুক্তি কো, তো সুমিরীজৈ রাম।
হরিয়া গৈলে চালতাঁ, জৈসে আবৈ গাম।।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

অনুভূতি এবং বিশ্বাস

দুটি সরল ও সহজবোধ্য কথা বলি। একটি হ'ল অনুভূতির কথা এবং অন্যটি বিশ্বাসের। অনুভূতি হ'ল—সংসার প্রতিমুহূর্ত বদলাচ্ছে একমুহূর্তেও স্থির থাকে না। বিশ্বাসের কথা হ'ল—পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকেন, কখনও বদলান না। যুগের পরিবর্তন হয়, ব্রহ্মা বদলে যান, কিন্তু এই পরমাত্মতত্ত্ব যেমনকার তেমনি থেকে যায়। অনুরূপভাবে তাঁর অংশ জীবাত্মারও কখনও অবিদ্যমানতা হয় না।

যা অপরিবর্তনশীল সেই পরমাত্মতত্ত্ব সব দেশে, সব কালে, সকল বস্তুতে সমস্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ। সবাই তাঁকে পেয়েছে। তাঁর দিকে দৃষ্টি না থাকা ভিন্ন কথা, কিন্তু তিনি অপ্রাপ্ত নন। কেননা তিনি সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আছেন। তাঁর কখনও অবিদ্যমানতা হয় না, কেননা তিনি ভাবরূপ। কেবল ঐদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি তো আছেনই। যদি দৃষ্টি দেন তো তিনি আছেন, যদি না দেন তাহলেও তিনিই আছেন। আপনারা যদি তাঁকে মেনে নেন তিনি আছেন, যদি না মানেন তাহলেও তিনিই আছেন। আপনারা যদি জানেন তো তিনি আছেন, যদি না জানেন তাহলেও তিনিই আছেন। অতএব আপনারা এটি বিশ্বাস করুন যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত রয়েছে। তাহলে তার অনুভূতি হয়ে যাবে।

অনুভূতির এই কথাটি আপনাদের বলেছি যে সমগ্র সংসার পরিবর্তিত হয় আর বিশ্বাসের এই কথাটি বলেছি যে পরমাত্মতত্ত্ব পরিবর্তনশীল নয় এবং সকলেরই তা প্রাপ্ত রয়েছে। যা পরিবর্তনশীল এবং অনিত্য তা 'প্রতীত' হচ্ছে। যা পরিবর্তনশীল নয় এবং নিত্য তা 'প্রাপ্ত' হয়েছে। এইভাবে দুটি প্রভেদ ঘটেছে—প্রতীত, এবং এবং অন্যটি প্রাপ্ত।

আমরা বলি ধন লাভ হয়েছে, মান পেয়েছি, সম্মান লাভ হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে কিছুই পাইনি। এ হ'ল প্রতীতি। কিন্তু সত্যই যদি তা পেয়ে যেতাম তাহলে তা আরও পা বার ইচ্ছা আমাদের হতো না, যতক্ষণ পাবার ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ প্রকৃত বস্তু পাওয়া হয়নি। গীতা পরিষ্কার বলেছে—**যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।** (৬/২২) যা পাওয়ার পর তার চেয়েও বেশি কিছু আছে—এমন কথা সে মানতেই পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে এই ইচ্ছা থাকবে যে আরও পাব, ধন, মান, স্বাস্থ্য আরও পাব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বস্তুই লাভ করেন নি—এটি হ'ল খাঁটি কথা।

নিজের বাস্তবিক বস্তু পেয়ে গেলে তখন 'আরও পাব' এই ইচ্ছা চিরতরে চলে যায়। তখন আর কোনও ইচ্ছা বাকি থাকে না।

যা দেখা যায় কিন্তু লাভ করা যায় না তাকে বলা হয় 'প্রতীতি'। মানুষের কাছে 'প্রতীতির' যত কদর 'প্রাপ্তর' কদর তত নয়—এই হ'ল সমস্যা। অতএব যা প্রাপ্ত রয়েছে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে শৈশবে আমি যা ছিলাম আজও আমি তাই আছি। শরীর পরিবর্তিত হয়েছে, মন বদলেছে, ভাব বদলেছে, ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন হয়েছে, দেশ বদলেছে, কাল বদলেছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, ঘটনাবলী বদলেছে, পরিবর্তন হয়েছে কর্মাবলীর—এই মন বদলে গিয়েছে, কিন্তু আমি তেমনই আছি। বেদান্তে আত্মার নিত্যতার জন্য প্রবল যুক্তি এই দেওয়া হয়েছে যে 'আমি সেই-ই'।

আট/দশ বছর পরে দুটি লোক পরস্পর মিলিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের বয়স বেশি, অপরজনের বয়স কম। কম বয়সের লোকটি প্রশ্ন করল, ''দাদু আপনি কি আমাকে চেনেন?'' সেই লোকটি উত্তর দিল, ''ভাই আমি তো চিনি না, তুমি কি আমাকে চেনো?'' কম বয়সের সেই লোকটি বলল, ''হ্যাঁ, আমি তো আপনাকে চিনি। দেখুন, অমুক সময়ে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং আমাদের মধ্যে এইসব কথা হয়েছিল। আমার শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।'' দাদু বললেন, ''আচ্ছা, তুমিই তাহলে।' অল্প বয়সে অর্থাৎ যৌবন পর্যন্ত শরীরে খুবই পরিবর্তন হতে থাকে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেলে চেহারায় তেমন কোনও পরিবর্তন আর হয় না। এইজন্যই সেই যুবককে বেশি বয়সী লোকটি চিনতে পারেন নি, কিন্তু যুবকটি তাঁকে চিনে নেয়। অল্প বয়সী লোকটি বলল, ''আজকাল কেমন চলছে?'' দাদু বললেন, ''আজকাল খুবই অসুবিধার মধ্যে আছি। রোজগার নেই, কিন্তু ঝামেলার অন্ত নেই। তুমি কেমন আছ?'' সেই লোকটি বলল, ''আমার কাজ কর্ম ভালই চলছে।'' এখন এতে চিন্তা করবার বিষয়টি হ'ল, আমিও সে এবং তুমিও সে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিস্থিতিতে খুবই পার্থক্য আছে। দু'জনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে কিন্তু ঐ দু'জন সেই একই রয়েছেন। অতএব আপনার সঙ্গে অবস্থাও থাকে না, পরিস্থিতিও থাকে না, আপনি স্বয়ং এগুলি থেকে ভিন্ন। এইগুলি সব পরিবর্তনশীল, প্রতীতিমাত্র। এইগুলিকে প্রকৃত মনে করলেই অনর্থের সৃষ্টি হয়। যতই অনর্থ সৃষ্টি হয় তা সবই এইগুলিকে স্থায়ী মনে করার ফল।

এখন প্রশ্ন হ'ল, 'প্রতীতি তো দৃশ্যমান কিন্তু প্রাপ্তকে দেখা যায় না। তাহলে প্রাপ্তকে আমরা কি করে মেনে নেব?' উপনিষদে একটি কথা আছে—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহদারণ্যক ২/৪/১৪) 'যিনি সবাইকে জানেন তাঁকে কী দিয়ে জানবেন? যেমন, চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা হয়, কিন্তু চোখ দৃশ্যমান নয়।' দর্পণে চোখের আকৃতি যদি বা দেখা যায় কিন্তু চোখ (নেত্রেন্দ্রিয়) দৃশ্যমান হয় না। অর্থাৎ যা দেখার শক্তি তাকে দেখা যায় না। দেখবার সেই শক্তির দ্বারাই সবকিছু দেখা হয়। তেমনই হ'ল প্রতীতি যার দ্বারা প্রতীত হয়, যে এই প্রতীতিকে জানে সেই হ'ল প্রাপ্ত বস্তু। সে যদি না থাকত তাহলে প্রতীতি কার হোত? যিনি এই পরিবর্তনশীল প্রতীতিকে দেখেন তাঁকে ঈশ্বর বলুন, জীবাত্মা বলুন, সৎ বলুন, ব্রহ্ম বলুন—এগুলি তাঁর কয়েকটি নাম, বাস্তবে সেটি একটিই তত্ত্ব।

এইবার যে প্রশ্নটি আসে তা হ'ল পরমাত্মতত্ত্ব তো প্রাপ্তই রয়েছে—তা প্রাপ্ত বলি আর নাই বলি—তাহলে তার উপর বিশ্বাস করার প্রয়োজন কী? এর উত্তর হ'ল, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে ততক্ষণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেও এতে আমাদের কোনও লাভ হবে না। বিশ্বাস করলে লাভ হবে, নইলে কিছুই হবে না। বিন্দুমাত্রও লাভ হবে না। এইজন্য পরমাত্মতত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস করতেই হবে। এতক্ষণ আমি পরমাত্মতত্ত্বের 'অস্তি' সম্পর্কে যে প্রবল যুক্তি উত্থাপন করেছি যার দ্বারা প্রতীতি হচ্ছে তিনিই 'অস্তি' অর্থাৎ 'আছেন'। কিন্তু লাভ হবে সেই 'অস্তি'-কে মানায়, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায়।

একজন লোকের গরুর অসুখ করেছিল। সে বৈদ্যের কাছে গেল। বৈদ্য বললেন যে আপনি গরুকে আধ পোয়া গোল মরিচ গুঁড়ো করে দিন আর তারপর পোয়াটাক ঘি দেবেন। লোকটি বাজার থেকে আধ পোয়া গোল মরিচ কিনে গুঁড়ো করে খাইয়ে দিল। দ্বিতীয় দিন বৈদ্যের কাছে গিয়ে বলল, 'মশাই গরুতো আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' বৈদ্য বললেন, 'কি করে হ'ল? তাকে গোল মরিচ খাইয়েছিলে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ খাইয়েছি।' বৈদ্য প্রশ্ন করলেন, 'ঘি দিয়েছিলে?' সে বলল, 'মশাই ঘি তো দিই নি, কেননা ঘি তো গরুর মধ্যেই ছিল, তা দেওয়ার দরকার কী? আমার গরু প্রতিদিন পোয়াটাক ঘি দেয়। কাল আমি দুধ দোহন করিনি। তাতে এক পোয়া ঘি তার মধ্যেই থেকে গিয়েছিল আর গোল মরিচ তো দিয়েছিলাম।' গরুকে না দোহন করে, গোল মরিচ খাইয়ে এবং ঘি না দেওয়ায় শরীর গরম হয়ে গিয়ে গরুর অসুখ আরও বেড়ে

গিয়েছিল। গরুর ভিতর ঘি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে এল না। যদি ঘি বার করে দেওয়া হোত তাহলে তাতে কাজ হোত। এইভাবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছাড়া তা আমাদের কোনও কাজে আসবে না। প্রাপ্ত হলেও তা আমাদের কাছে অপ্রাপ্তের মতো থেকে যাবে। সেই প্রাপ্ত তত্ত্বের প্রাপ্তি (অনুভূতি)-র জন্যই আমরা সকলে এখানে একত্র হয়েছি। সেটি প্রাপ্ত রয়েছে কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না—এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি হলে তবেই তার অনুভূতি লাভ হবে। কেবল কথায় কোনও কিছুই হবে না। আমার মতো আপনারাও বক্তৃতা দিতে শিখে যাবেন তাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। এইজন্যই বলি যে আপনারা সেই তত্ত্ব থেকে কেন বঞ্চিত রয়েছেন? শিশু যদি বুঝতে পারে যে মা সেখানে রয়েছেন তাহলে তাকে তিনি কোলে নিচ্ছেন না বলে সে কাঁদতে থাকে। 'পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত' রয়েছে—এ কথা এজন্যই বলেছি যে তাঁকে জানার জন্য আপনাদের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হোক। 'তিনি তো প্রাপ্ত রয়েছেন, তাহলে আর তাঁকে জানার, তাঁকে বিশ্বাস করবার প্রয়োজন কী?'—এইরকম ভাবনা হ'ল চরম মূর্খতা। প্রাপ্তকে প্রাপ্তি (অনুভূতি) করতে হবে। তাঁর প্রাপ্তি প্রতীতিকে সত্য মনে না করলেই হবে—এটি হ'ল চাবি। চার বেদ, ছয় শাস্ত্র ইত্যাদি যতই পড়ুন না কেন প্রতীতিকে সত্য মনে করে ধরে থাকলে সেই পরমাত্মতত্ত্ব কখনওই প্রাপ্ত হবে না। প্রতীতিকে সত্য জেনে মেনে নিয়ে যদি এই ভাবনা থাকে যে ধন-সম্পদ থাকবে, তার দ্বারা অমুক হয়ে যাবে, নীরোগ হবে, এত বাড়ি তৈরি করবেন ইত্যাদি তাহলে সোজা নরকে যেতে হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। ধন, সম্পদ, বাড়ি, কুটুম্ব প্রভৃতি কেউই আপনাকে নরক থেকে বাঁচাতে পারবে না।

শ্রোতা—মহারাজ। এটি তো বুঝতে পারি যে প্রতীতি থাকার নয়, তবু তা আমাদের আকৃষ্ট করে।

স্বামীজী—আপনারা প্রতীতিকে প্রতীতি না মনে করে নিত্য বলে মনে করেন, তাই তা আকৃষ্ট করে। সিনেমাতে ভাল খাদ্য দেখলে সেগুলিকে কি খেতে প্রবৃত্তি হয়? হয় না। তার কারণ যে আপনারা জানেন যে তা থেকে কিছুই পাবেন না। সেইরকম সংসারেও কিছু পাবার নেই। আজ পর্যন্ত সংসারে কেউ কিছু পায়নি। আপনারা যদি চান তো একে পেয়েছেন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু এ হ'ল নিছক ভ্রম। যা চলে যাচ্ছে তাকেই সংসার বলা হয়—**'সম্যক্ প্রকারেণ সরতীতি সংসারঃ'**। যা প্রতিমুহূর্তে চলে যায় তাকে কি

করে পাওয়া যাবে? এই সংসার থেকে বিমুখ হলেই সেই পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হবে।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধ

সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ চিরন্তন নয়, এই বাস্তবিকতাকে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই জানার উপর আমরা স্থিত থাকি না—এইটিই ভ্রম। যদি এর উপর আমরা স্থিত থাকি অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না মনে করি তাহলে এখনই আমাদের উদ্ধার হয়ে যাবে। এই সংসারের সঙ্গে আমরা নিজেদের যে সম্বন্ধ মেনে নিই তাকে ত্যাগ না করে আমরা বাঁচতেই পারি না। সংসারের সম্বন্ধ ছাড়া আমরা থাকতে পারি কিন্তু তার বিয়োগে আমরা থাকতে পারি না, বাঁচতেই পারি না। এই কথাটি আপনারা খুব মন দিয়ে চিন্তা করুন। সংসারের যেসব বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থের সঙ্গে আমরা নিজেদের সম্বন্ধ মেনে নিই তাঁদের সম্বন্ধ থেকে আমরা ততটা সুখ পাই না যতটা সুখ আমরা তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ থেকে পেয়ে থাকি। যেমন যখন আমাদের গভীর ঘুম হয় সেইসময় কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। গাঢ় নিদ্রাতে আমরা সমস্ত বস্তু-ব্যক্তিকে ভুলে যাই। সেই অবস্থায় যতটা সুখ পাওয়া যায় তাদের মনে রেখে, তাদের সঙ্গে থেকে ততটা সুখ পাওয়া যায় না—এটি আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা।

এখন মন দিয়ে আপনারা কথাটি ভাল করে বুঝুন। নিদ্রা যাবার প্রবৃত্তি আমাদের জন্ম থেকেই রয়েছে। আপনারা যদি স্মরণ করেন তাহলে দেখবেন যে ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ঘুমিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ সংসারকে ভুলে থেকেছি। না ঘুমিয়ে অর্থাৎ সংসার থেকে বিমুখ না হয়ে আমরা অষ্ট প্রহর জেগে (বেঁচে) থাকতে পারি না। যদি বেশ কিছুদিন ঘুম না আসে তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। যতটা পোষণ-সামগ্রী আমরা ঘুম থেকে পাই ততটা পোষণ-সামগ্রী আমরা পদার্থ বা মানুষের সম্বন্ধ থেকে পাই না। পদার্থ এবং মানুষের সম্বন্ধ থেকে তো ক্লান্তি আসে। ঘুম থেকে সেই ক্লান্তি দূর হয় আর শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণে নতুন শক্তি, স্ফূর্তি এবং সতেজতা এসে যায়। পদার্থ এবং ব্যক্তির সম্বন্ধ থেকে সতেজতা নষ্ট হয়ে যায়।

শৈশবে খেলনা যত ভাল লাগত ততটা ভাল পদার্থ এবং ব্যক্তিকে লাগত না। খেলা যতটা ভাল লাগত ঘর ততটা ভাল লাগত না। এখন যৌবনে অর্থ ভাল লেগে গিয়েছে। এখন আর খেলনা ভাল লাগে না, কিন্তু ঘুম তেমনই প্রিয় লাগে। যখন খেলনা ভাল লাগত তখনও ঘুম ভাল লাগত এবং ঘুম থেকে সুখ পাওয়া যেত। এখন যদিও অর্থ ভাল লাগছে তাহলেও ঘুম ভাল লাগছে। কিন্তু অর্থকে ভুলিয়ে দিয়ে যে ঘুম আসে সেই ঘুম টাকা-পয়সার চেয়েও বেশি ভাল লাগে। যখন বিবাহ হয় তখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবার বড় ভাল লাগে। তাদের জন্য টাকা পয়সাও খরচ করি। কিন্তু যখন গভীর ঘুম আসে তখন স্ত্রীকে, পুত্রকে, আত্মীয়স্বজনকেও ছেড়ে দিই। মোহবশতঃ যাদের জন্য ছল, কপট, বেইমানী, চুরি, মিথ্যা, ঠগবাজী, প্রবঞ্চণা প্রভৃতি করে থাকি গাঢ় নিদ্রায় সেই সবই ছেড়ে দিয়ে থাকি। যখন বৃদ্ধাবস্থা হয় তখন পরিবারে পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীর প্রতি মোহ বেড়ে যায়। কিন্তু গভীর ঘুম এলে এদেরও ছেড়ে দিই। যদি বৈরাগ্য এসে যায় তাহলে সম্পদ, বাড়ি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রভৃতিকে ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে যাই, বিরক্ত-ত্যাগী হয়ে যাই, তখনও নিদ্রা যাই। নিদ্রার মধ্যে সাধুগিরিও বিচ্ছেদ হয়, বিরক্ত-ত্যাগ ভাবেরও বিচ্ছেদ হয়। এইভাবে সকল পরিস্থিতিতেই ঘুম ভাল লাগে। ঘুম না হওয়ায় ভাল লাগছে এইরকম ভাব কখনও হয় না, বরং ঘুম এলে ভাল এমন ভাবই থাকে। ঘুমাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ভাল বিছানা পাতা হয়। ভাল বালিশ, গদি পাতা হয়। পাখা টাঙান হয়—যাতে সহজে ঘুম আসে। যাতে সোরগোল না হয় তার ব্যবস্থা করি। যখন ঘুম পায় তখন বিভিন্ন রকমের ভোগ, মনোহর দৃশ্য, সিনেমা প্রভৃতি ভাল লাগে না। তখন এই কথাই বলি যে ভাই, এখন আমাকে ঘুমাতে দাও, আমি এখন ঘুমাব। এতে প্রমাণ হ'ল যে নিদ্রা সকল বস্তু-ব্যক্তির চেয়েও বেশি প্রিয়। ঘুমের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ঘুমকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু কখনও যদি ভগবানের ভজনে প্রেম জন্মায়, ভজনে রস পাওয়া যায় তাহলে তখন ঘুমও ভাল লাগে না। সাধুদের কথা হ'ল—**'বৈরিন হো গয়ী নিঁদরিয়া'** অর্থাৎ এই নিদ্রা তো আমার শত্রু হয়েছে। নিদ্রা না এলেই ভাল। এতে প্রমাণ হ'ল যে যার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রিয় নিদ্রাকেও ত্যাগ করা হয় সেই পরমাত্মার সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সাজানো ব্যাপার, ভ্রমবশত তাকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই সংসারের সঙ্গে সংযোগ ছাড়াও আমরা বাঁচতে পারি, কিন্তু তার বিয়োগে আমরা

থাকতে পারি না। সংসারের বিয়োগেই সুখ—এমন অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের।

সংসার থেকে বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা জীবমাত্রেরই আছে—এটি কত বড় কথা। মানুষ, পশু, পাখি সবাই নিদ্রা যায়। তাৎপর্য হ'ল সকল প্রাণীই চায় সংসার থেকে বিচ্ছেদ হোক। সংসারের ন্যূনতা থাকলে তো জীবনযাত্রায় তেমন কোনও অসুবিধা হয় না; যেমন, কেউ ভাল খাদ্য পায়, কেউ পায় না; কেউ ভাল বাড়ি পায় তো কেউ পায় না, এইসবে সকলের মধ্যে বৈষম্য আছে। দু'জন মানুষের আরাম-সামগ্রীও একরকম হয় না। কিন্তু নিদ্রা সকলেরই একরকম। এখানে একটি কথা চিন্তা করার বিষয় যে নিদ্রার প্রতি আমাদের যে প্রবৃত্তি তার জন্য আমাদের না কোনও উদ্যোগ করতে হয়, না চিন্তা করতে হয়, না কাজ করতে হয়। তার জন্য কিছু মনে করতেও হয় না। তাৎপর্য হ'ল কিছু না করলেও নিদ্রা এসে যায়। নিদ্রার জন্য চেষ্টা কর তবেই নিদ্রা আসবে এমন কথা নয়।

ঘুমের সময় সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু সংসারের সঙ্গে স্বীকৃত সম্বন্ধকে আঁকড়ে থেকে ঘুমান হয় বলেই জেগে উঠে তাতেই (সংসারে) ফেঁসে যাই। তাহলেও সংসারের সঙ্গে স্বীকৃত সম্বন্ধ স্থির থাকে না। অবস্থা পরিবর্তিত হয়, পরিস্থিতি বদলে যায়, ঘটনা, ব্যক্তি, দেশ, কাল বদলে যায়—এই সবই তো বদলে যায় কিন্তু সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ কখনও বদলায় না। কারণ হ'ল, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ তো আমাদের মেনে নেওয়া হয়েছে। এ অবাস্তব। কিন্তু সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া হয়নি, বরং তা হ'ল বাস্তব। সেইজন্যই সংসার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ নিরন্তর হচ্ছে। শৈশবাবস্থা থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়েছে, যৌবন থেকে হয়েছে। বৃদ্ধাবস্থা থেকে হয়েছে, নিরোগ অবস্থা থেকে হয়েছে, রোগ অবস্থা থেকে হয়েছে, ধনাঢ্য অবস্থা থেকে হয়েছে, হয়েছে নির্ধনতা থেকে এবং কিছু মানুষের সঙ্গে মিলন হয়ে আবার বিচ্ছেদ হয়েছে। এইভাবে সংসারের সম্বন্ধ তো ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে; কারণ এই সম্বন্ধ হ'ল কৃত্রিম, মেনে নেওয়া বিষয়। আমাদের বড় ভুল হ'ল এই যে আমরা মনে করা সম্বন্ধকে প্রকৃত মনে করেছি কিন্তু সংসার থেকে যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হচ্ছে সেদিকে খেয়াল করিনি, যদিও সেইটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে যত সুখ তত সুখ বস্তুতে হয় না। তা যদি হতো তাহলে ঘুম পরিত্যক্ত হত।

যখন ভগবানের ভজনে রস পাওয়া যায় তখন নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণাও ভাল

লাগে না, সেগুলির কোনও পরোয়া থাকে না। শরীর-নির্বাহের জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রধান বস্তু, কিন্তু ভজনের সময় এগুলিকেও ভুলে যাওয়া হয়। এর অর্থ হ'ল এই যে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে। প্রকৃত সম্বন্ধ যখন জাগ্রত হয় তখন নকল সম্বন্ধকে আজ কে ধরে রাখতে চাইবে? শরীর সংসারের সঙ্গে মনে করে নেওয়া কৃত্রিম সম্বন্ধকে যদি আমরা ত্যাগ করি তাহলে আজই আমরা সফল হয়ে যাব। সম্বন্ধকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হবে না, না জঙ্গলে যেতে হবে, না সাধু হতে হবে। কেবল এটি মেনে নিতে হবে যে এই সংসার বাস্তবে আমাদের নয়, কেবল ভগবানই আমাদের। ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তা তাঁদের সেবার জন্য। বস্তুর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তা হ'ল সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগাবার জন্য। আমাদের জন্য না কোনও বস্তু আছে, না কোনও ব্যক্তি আছে। আমাদের বলে যাদের বলা হয় সেই মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ সকলের সেবা কর, ব্যাস তা হলেই হয়ে যাবে। বস্তুগুলি তাদের সেবার জন্য রয়েছে আর তারা সেব্য। শরীর তাদের, তাই তাদের সেবার জন্য শরীরকে নিয়োগ করুন। তাঁদের কাছ থেকে কিছুই নেবার নেই। তাদের জিনিস তাদেরই সেবায় নিয়োগ করতে হবে। একেই কর্মযোগ বলে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।

(গীতা ২/৪৭)

'তোমার অধিকার কর্তব্য-কর্ম করায়, কখনওই ফলের নয়। অতএব তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো না এবং অকর্মণ্যতার প্রতিও যেন তোমার আসক্তি না থাকে।'

খুব তৎপরতার সঙ্গে, ভালভাবে কাজ করতে হবে। কেননা মানুষের শরীর সেবা করবার জন্যই পাওয়া গিয়েছে, ভোগ করবার জন্য নয়। আমাদের যে বিবেক লাভ হয়েছে তা শরীরের সঙ্গে মনে করে নেওয়া সম্বন্ধকে বিচ্ছেদ করার জন্যই পাওয়া গিয়েছে, শরীরের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য নয়।

সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেবল সেবা করবার জন্যই। সেবা ছাড়া সংসারের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। মা-বাবার সেবা করতে হবে, স্ত্রী-পুত্রের পালন পোষণ করতে হবে, সেবা করতে হবে। তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নিলে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তি তো তাদের সেবা করে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলেই পাওয়া যাবে। সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া এমন কোনও সম্বন্ধ নেই

যার জন্য মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাও ত্যাগ করবে। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জাগ্রত হয়ে গেলে নিদ্রা ভাল লাগে না, খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগে না এমনকি শরীরের প্রতি মোহ্ও ভাল লাগে না; তার কারণ ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই প্রকৃত।

নারদের পূর্বজন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে তিনি জঙ্গলের দিকে চলে যান। তাঁর এই খেয়ালই হয়নি যে জঙ্গলে তিনি কী খাবেন? কোথায় থাকবেন? সেখানে এক গাছের নিচে তিনি বসেছিলেন। তাঁর মন ভগবানের প্রতি মগ্ন হয়েছিল। তাঁর সমাধি হয়েছিল। তাঁর ভগবানের অনুভূতি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তখন আকাশবাণী হয়েছিল যে এই শরীর চলে যাবার পর যখন তোমার ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম হবে তখন তুমি আমার দেখা পাবে। এই আকাশবাণী শুনে নারদ কবে তাঁর এই শরীর চলে যাবে, কবে তাঁর মৃত্যু হবে তার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করতে থাকেন। পৃথিবী শুদ্ধ লোক চায় আমরা সর্বদা যেন বেঁচে থাকি আর তিনি চান তাঁর মৃত্যু হোক।

সংসারে নিজের শরীরের বেঁচে থাকার যত ইচ্ছা, আত্মীয়দের বেঁচে থাকার জন্য ততটা ইচ্ছা হয় না। গরু তার বাচ্চাকে খুব ভালবাসে। সে তার বাচ্চাকে ছেড়ে জঙ্গলে চরতেও যায় না। কিন্তু তাকে যখন লাঠি মারা হয় তখন সে জঙ্গলে চলে যায়। জঙ্গলে ঘাস খেতে খেতে যখন তার বাচ্চার কথা মনে পড়ে তখন সে 'হাম্বা' বলে চেঁচায় আর তখন তার মুখ থেকে ঘাস পড়ে যায়। সন্ধ্যার সময় যখন সে ফিরে আসে তখন সে অন্য গরুদের চেয়ে এগিয়ে যায় এবং হুংকার দিতে দিতে তার বাচ্চার কাছে চলে যায়, তাকে আদর করে, তাকে দুধ খাওয়ায়। এইভাবে তার বাচ্চার প্রতি ভালবাসা আছে। ঘাসের ওপরও ভালবাসা আছে। আর সবচেয়ে বেশি ভালবাসা আছে নিজের শরীরের প্রতি। যখন শরীরের ওপর লাঠি পড়ে তখন বাচ্চা, ঘাস সব ছেড়ে দেয়। যখন শরীরে বিপদ আসে তখন সে কাউকে পরোয়া করে না। তাৎপর্য হ'ল নিজের শরীরের প্রতি তার প্রেম হ'ল প্রথম,বাচ্চার প্রতি প্রেম দ্বিতীয় এবং ঘাসের প্রতি তিন নম্বর প্রেম আছে। অতএব শরীরের মোহ তো পশুদেরও হয়। কিন্তু মানুষ শরীরের মোহ ত্যাগ করে ভগবানের প্রতি প্রেম করতে পারে।

শরীর তো সর্বদা বদলাতে থাকে। অতএব তা তো সবসময় থাকে না। কিন্তু ভগবান সর্বদা বিদ্যমান। আমরা তো ভগবানেরই —যখন এই পরিচয় হয়ে যায় তখন মানুষ শরীরের আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে ভগবানে মগ্ন হয়ে যায়।

সুতরাং ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রকৃত এবং শরীর-সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কৃত্রিম—এই বাস্তবিকতাকে জেনে সর্বপ্রকারে ভগবানেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

শরীরের সঙ্গে বিযুক্তির অনুভূতি

ভগবান মানুষের কল্যাণকর সামগ্রী কম দেননি, বরং অনেক বেশি দিয়েছেন। বয়সও অনেক বেশি দিয়েছেন। কল্যাণ মুহূর্তের মধ্যে হতে পারে কিন্তু তার জন্য অনেক বছরের বয়স দিয়েছেন। একটুখানি চিন্তা করলেই কল্যাণ হতে পারে, কিন্তু বিচার করবার শক্তি দিয়েছেন প্রচুর। সকল সামগ্রী এত দিয়েছেন যে মানুষ যেন তার কল্যাণ কয়েকবার করে নিতে পারে। যদিও বাস্তবে একবার কল্যাণ করলে আর দ্বিতীয়বার কল্যাণ করবার প্রয়োজনই হয় না। কত বিচিত্র জিনিসই না ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। যেমন, একটি কথা আপনারা চিন্তা করুন। আপনাদের এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে যে ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা সব বদলে গিয়েছে, কিন্তু আমরা সেই একই আছি। পরিবর্তনশীলকে ত্যাগ করলে আর যা বদলায়নি তাকে ধরে রাখলে এই মুহূর্তে সব মুক্ত হয়ে যাবে। যা বদলায় সেটি আমার স্বরূপ নয় আর যা বদলায় না সেইটিই আমার স্বরূপ। ব্যাস, এইটুকুই কাজ।

অনেক পরিস্থিতিতে, অনেক ঘটনায় আপনারা একই থাকেন। অনেক দেশে ঘোরাঘুরি করেও আপনারা একই থাকেন। অনেক সময় অতীত হলেও আপনারা সেই একই থাকেন, সবকিছু বদলালেও আপনারা সেই একই থাকেন। যা একই থাকে, কখনও বদলায় না, তাকে যদি আপনারা পরিবর্তনশীল বস্তুদের থেকে আলাদা করে দেখেন তাহলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাবে; আর ঐ দুটিকে যদি জুড়ে নিয়ে দেখেন তাহলেই অজ্ঞান।

যেসব ভাই-বোন সাধনা করেন তাঁদের মনে একটি কথা দৃঢ় হয়ে আছে যে মন নির্বিকার হলে, কোনও ঘটনার প্রভাব তার উপর না পড়লে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়, আর যদি প্রভাব পড়ে তাহলে তত্ত্বজ্ঞান হ'ল না। আপনারা এই কথাটি ভাল করে বুঝে নিন যে প্রভাব কার উপর পড়ে? প্রভাব মনের উপর পড়ে, বুদ্ধির উপর পড়ে, শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়গুলির উপর পড়ে, কিন্তু আপনারা

তো সেই একই থাকেন, অর্থাৎ আপনাদের উপর প্রভাব পড়ে না। অর্থ সমাগম হ'ল লাভ হ'ল, আপনাদের মন তাতে প্রসন্ন হ'ল, অর্থ ক্ষয় হ'ল, লোকসান হ'ল তো আপনাদের মন তাতে দুঃখিত হ'ল। লাভ-লোকসান মনের উপর দু'রকমের প্রভাব হ'ল, কিন্তু আপনারা তো সেই একই থেকে গেলেন। লাভ যখন হয়েছিল তখন আপনি একরকম ছিলেন আর লোকসান যখন হয়েছিল তখন অন্যরকম, এমন কি হয়? আপনারা যদি এক না থাকতেন তাহলে লাভ-লোকসান দুটির জ্ঞান কার হতো? আপনারা তো সমান থাকেন, একই থাকেন। আপনাদের উপর প্রভাব পড়ে না। প্রভাব পড়ে বুদ্ধি এবং মনের উপর।

তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যখন শৈশব থেকে যুবাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়ে যান তখন তিনি চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন, চলা-ফেরা কমে আসে। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে কোনও পার্থক্য হয় কি? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—এই সবই পরিবর্তনশীল, এগুলির মধ্যে কোনওটি যদি বদলে যায়, কারও উপর যদি প্রভাব পড়ে তো তাতে কী হ'ল? আপনারা তার সঙ্গে নিজেদের (স্বভাবকে) মিলিত করে সুখ-দুঃখ স্বীকার করে নেন, এইটিই হ'ল ভ্রম। আপনারা এই বিষয়ে দৃঢ় থাকুন যে আমরা তো সেই একই। সুখের সময় যা দুঃখের সময়েও তাই আছি আর দুঃখের সময় যা ছিলাম, সুখের সময়েও তাই আছি। এইরকম যা যায়-আসে তার সঙ্গে মিলিত না হয়ে আপনাতে আপনি স্থিত থাকাই হ'ল 'স্বস্থ' থাকা '**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ**' (গীতা ১৪/২৪)। যা যায়-আসে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখী-দুঃখী হওয়া হ'ল 'প্রকৃতিস্থ' হওয়া—'**পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে**' (গীতা ১৩/২১)। আপনারা প্রকৃতিতে স্থিত নন, তবু জেনে শুনে তাতে স্থিত হয়ে যান। আপনারা সুখেও নেই, দুঃখেও নেই, লাভেও নেই ক্ষতিতেও নেই কারও জন্মতেও নেই, মরণেও নেই, আপনারা এইসব থেকে ভিন্ন। আপনারা জেনে শুনে এগুলিকে টেনে আনেন এবং সুখী-দুঃখী হয়ে যান। তারপর বলেন যে বোধোদয় হয় না। আপনারা এই বিষয়ে দৃঢ় থাকুন যে আপনারা সেই একই। লাভ হলেও আপনারা সেই আর লোকসান হলেও সেই একই। আপনারা 'স্ব'-তে (আপনা-আপনিতে) স্থিত হয়ে যান, ব্যাস। '**স্ব**' সর্বদা নির্বিকার, 'স্ব'-তে কখনও বিকার হয় না। বিকার অন্তঃকরণে হয়। আপনারা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিকার মেনে নেন আর সুখী-দুঃখী হয়ে যান।

আপনাদের মনে যদি ভাল আসে, মন্দ আসে, চিন্তা, আনন্দ, রাগ, দ্বেষ আসে তো তা সত্ত্বেও আপনারা আপনাতে স্থিত থাকুন, সেগুলির সঙ্গে

মিলবেন না। সেগুলির সঙ্গে মিলিত হওয়া হ'ল প্রকৃতিস্থ হওয়া। প্রকৃতিস্থ হলে পাপও স্পর্শ করবে, দুঃখ হবে, চুরাশি লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে, নরকও হবে, জন্ম-মৃত্যুও হবে—**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু**' (গীতা ১৩/২১)। অতএব যা সৃষ্টি হয়, নষ্ট হয়, আসে, যায় সেগুলিকে দেখেও আপনারা আপনাতে স্থিত থাকুন; কেননা আপনারা সেগুলির দ্রষ্টা (সেগুলি থেকে আলাদা)। সুখদায়িক পরিস্থিতিকে আপনারা দেখেন আবার দুঃখদায়ক পরিস্থিতিকেও আপনারা দেখেন। সংযোগকেও আপনারা দেখেন, বিয়োগকে আপনারা দেখেন। যিনি দেখেন তিনি যা দেখেন তা থেকে ভিন্ন—এই হ'ল নিয়ম। অতএব দ্রষ্টা আপনাদের মধ্যে কী তফাৎ হ'ল? দ্রষ্টা আপনারা তো সেই একই থাকলেন।

আমরা গঙ্গা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক কাষ্ঠখণ্ড বাহিত হয়ে এল এবং আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আজ আনন্দ হ'ল বলে আমরা খিল খিল করে হেসে উঠলাম। পরের দিন সেইখানেই দাঁড়ালাম, কিন্তু একটি কাষ্ঠখণ্ডও আমাদের দিকে এল না, অন্য দিক দিয়ে চলে গেল। আমরা জোরে কাঁদতে লাগলাম। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন কাঁদছেন? আমরা বললাম আজ একটা কাষ্ঠখণ্ডও আমাদের পাশ দিয়ে গেল না। আপনারা চিন্তা করুন যে, কাষ্ঠখণ্ড আমাদের পাশ দিয়ে গেল কি অন্য দিক দিয়ে গেল তাতে আমাদের কী? আমরা তো কাষ্ঠখণ্ডকে স্পর্শই করি না। তা আমাদের কাছে থাকেও না, তা তো বয়ে যায় আর আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু সেগুলি পাশ দিয়ে গেলে ভারি মজা আর দূর দিয়ে গেলে কাঁদতে লাগলাম—এতো মূর্খতা। এইভাবেই ছেলে হলে আপনারা খুশী আর ছেলে মারা গেলে কাঁদতে থাকেন। অন্য কারও যদি ছেলে হয় এবং সে মারা যায় তো আপনারা কাঁদেন না। তাদের কাছে অর্থ এল এবং চলে গেল তাতে আপনারা কাঁদেন না। আপনাদের কাছে অর্থ এসে যদি চলে যায় তাহলে আপনারা কাঁদেন। আপনাদের কাছে প্রথমে ছিল না, মাঝে এল এবং পরে চলে গেল তো আপনারা প্রথমে যা ছিলেন পরেও তাই থাকলেন, তাহলে কান্না কিসের জন্য? আপনারা যদি আপনাতে স্থিত থাকেন তাহলে কাঁদবেন না। কিন্তু যা যাওয়া-আসা করে তার সঙ্গে যদি জুড়ে যান তাহলে মিছেই কাঁদবেন।

সংসারের দুঃখ আপনারা অকারণেই আঁকড়ে রেখেছেন। বাস্তবে দুঃখ বলে কিছু নেই। ভগবান দুঃখ সৃষ্টি করেননি। আপনারাই দুঃখ সৃষ্টি করেন। আপনাদের যে কিসের সখ বুঝি না। আপনারা পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে

মিলিত হবেন না। যদি মিলিত হন তাহলেই দুঃখিত হতে হবে। আমি পরিবর্তনশীল বস্তু থেকে আলাদা—এইভাবে মনে করুন। ঐগুলি থেকে বিচ্ছেদের পরিস্কার অনুভূতি হলে সব দুঃখ, বিকার চলে যাবে।

শ্রোতা— আমরা তো ঐগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি, বিচ্ছিন্ন হব কি করে?

স্বামীজী—আপনারা মোটেই মিলিত হয়ে নেই, তা যদি থাকতেন তাহলে আজ পর্যন্ত আপনারা শিশুই থেকে যেতেন, বৃদ্ধ হতেন না। কিন্তু আপনারা বলেন যে শৈশবে আপনারা যা ছিলেন আজও তাই আছেন, যদ্যপি শৈশব আপনাদের সঙ্গে নেই আর আপনারাও শৈশবের সঙ্গে নেই। তাহলে আর আপনারা মিলিত হলেন কি করে? শরীরাদি পরিবর্তনশীল কিন্তু আপনাদের কখনও পরিবর্তন হয় না। আপনারা ভ্রমবশত নিজেদের সেগুলির সঙ্গে মিলিত বলে মেনে নিয়েছেন। ব্যাস এটি আপনারা মনে করবেন না। আপনারা ঐগুলির সঙ্গে মিলিত রয়েছেন এমন দেখা গেলেও তাকে সমাদর করবেন না। বরং আমরা সেগুলি থেকে ভিন্ন এই অভিজ্ঞতাকেই সমাদর করবেন। ভিন্ন এইভাবে যে আমাদের শরীর শৈশব থেকে বদলে গিয়েছে, কিন্তু আমরা সেই একই আছি। এটি হ'ল প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। আপনারা শরীরাদি থেকে ভিন্ন বলেই তো শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে আর আপনারা থেকে গিয়েছেন। এইভাবে যৌবনাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থাও চলে যাবে আর আপনারা থেকে যাবেন। যেমন শৈশবকালে আপনারা তা থেকে ভিন্ন ছিলেন তেমনি আজ যৌবনাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থাতেও আপনারা ভিন্ন। এসব সত্ত্বেও যদি আপনাদের সঠিক অনুভূতি না হয়ে থাকে তাহলে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে বলুন ''হে প্রভু! আমাদের এই অনুভূতি জাগছে না।'' এই কথাটি পাকাপাকি জেনে রাখুন যে আমরা আছি ভিন্ন হয়েই, সেই অনুভূতি আমাদের হোক বা নাই হোক। ভিন্ন না হলে মৃত্যুর পর শরীর এখানে থাকত না, সঙ্গে যেত, নয় তো শরীরের সঙ্গে আপনারাও এখানে থেকে যেতেন। কিন্তু না আপনারা শরীরের সঙ্গে থাকেন, না আপনাদের সঙ্গে শরীর যায়। তাহলে উভয়ে কি করে এক হলেন? বাড়িতে আমি থাকি, তাহলে আমি বাড়ি হলাম কি করে? আমি বাড়িতে আছি এবং বাড়ি থেকে চলে যাই। তাহলে আমি এবং বাড়ি দুটি ভিন্ন হলাম। এইরকম শরীরও একটি বাড়ি এবং আপনারা সেখানে থাকেন। আপনারা সেখানে থাকেন আবার চলেও যান। তার সঙ্গে আপনারা এক নন।

আমি শরীর থেকে ভিন্ন—এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে জোর করে তা মেনে নিন। যেমন ব্যাধি মুক্ত হবার জন্য আপনারা ভীষণ তেতো ঔষধ,

চিরতার জল প্রভৃতি চোখ বন্ধ করে খেয়ে নেন, তেমনি সুস্থ হবার জন্য আপনারা 'আমরা ভিন্ন' এটি মেনে নিন। তাতেও যদি ভিন্ন বলে মনে না হয় তাহলে কি করে শীঘ্রই ভিন্নতা অনুভূত হয়,তার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান। ব্যাকুলতা প্রবল হলে তাড়াতাড়ি অনুভূতি জাগবে। নইলে ভোগে যুক্ত হয়ে থাকলে, ভোগ করতে থাকলে যতই লেখাপড়া করুন, পাণ্ডিত্য অর্জন করুন, সমগ্র বেদ-শাস্ত্রে পারঙ্গম হেন না কেন— ভিন্নতার অনুভূতি কখনওই হবে না।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

সুখ-লোলুপতা দূর করবার উপায়

যদি আপনারা সংসর্গজনিত (সাংসারিক) সুখের আসক্তি দূর করেন তাহলে এখনই পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত হবে। সংসর্গজনিত সুখের জন্য যে আকর্ষণ সেইটিই আসল ব্যাধি। চিন্তা করলে এটি ভালভাবে বোঝা যায় যে সংসর্গজনিত সুখের লালসাই হ'ল পরমাত্মপ্রাপ্তির প্রধান বাধা। সংসর্গজনিত অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে যে সুখ সৃষ্টি হয় তা নিত্য নিরন্তর কি করে থাকতে পারে? কেননা যে জিনিস উৎপন্ন হয় তা বিনষ্টও হয়। যদি সংসর্গজনিত সুখ অসহ্য হয়ে যায়, এই কৃত্রিম সুখকে ত্যাগ করা যায় তাহলে 'সহজ সুখ' প্রকট হয়ে যাবে, কারণ এটি স্বয়ং সহজ সুখ-স্বরূপ।

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী।।

(মানস ৭।১১৭।১)

যতক্ষণ না সংসর্গজনিত সুখ ত্যাগ করছেন ততক্ষণ 'আমাদের সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে নয়, আমাদের সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে' এই কথা শুনলেও কাজে আসবে না। এইভাবে 'সংসার বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর' এমন কথা শুনলে ও স্মরণ করলেও অনুভূতি হবে না। সংসার অনিত্য—এমন বললে, শিখে নিলে, মুখস্থ করলেও সংসার বন্ধনদশা দূর হয় না। তাৎপর্য হ'ল যতক্ষণ পর্যন্ত সাংসারিক সংসর্গজনিত সুখের প্রতি আসক্তি থাকবে ততক্ষণ সংসারের অনিত্যতা অনুভূত হবে না। কারণ হ'ল সংসর্গজনিত সুখকে সত্য মনে করে তাকে পেতে ইচ্ছা করলে সংসারের অনিত্যতা কি করে অনুভব করবেন?

এই কথাটি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে সংসর্গজনিত সুখ নিলে দুঃখ পেতেই হবে। এমন কোনও প্রাণী থাকতেই পারে না যে সংসর্গজনিত সুখভোগ করতে থাকবে কিন্তু তাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে না। সে দুঃখ থেকে রেহাই পাবে তা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও মানুষ সংসর্গজনিত সুখ কেন ত্যাগ করে না? এখন সংসর্গজনিত সুখের প্রতি তার যত আকর্ষণ, যত প্রিয়তা, বিশ্বাস এবং ভরসা তার পরিণাম সম্পর্কে ততটা চিন্তা তার নেই। সুখভোগের পরিণামে কী হবে, সেকথা সে চিন্তাই করে না। তার চিন্তায় যদি সেকথা আসেও তাহলেও সে চোখ বন্ধ করে রাখে, তা জানতে চায় না। এইজন্য ভগবান রাজস সুখ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সংসর্গজনিত সুখ প্রারম্ভে অমৃতের মতো আর পরিণামে বিষের মতো—'**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব** ... (গীতা ১৮।৩৮)। এর পরিণামের চিন্তা মানুষই করতে পারে, পশু-পাখি প্রভৃতির মধ্যে এই চিন্তা করার শক্তিই নেই। দেবতারা তো সুখভোগের জন্যই স্বর্গে থাকেন, তাঁরা এর পরিণাম সম্পর্কে কী জানবেন? মনুষ্য-শরীর কেবল পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করবার জন্যই পাওয়া গিয়েছে। অতএব পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করবার যোগ্যতা এর আছে। তাই সংসর্গজনিত সুখের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা মানুষকে সবসময় করতে হবে। প্রতিমুহূর্তে চিন্তা করতে হবে যে এর পরিণাম কী হবে? সাংসারিক সুখের পরিণাম দুঃখই হয়। ভগবান গীতায় বলেছেন—'**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে**' (গীতা ৫।২২।) অর্থাৎ যত সম্বন্ধজনিত সুখ আছে সেগুলি সবই দুঃখের কারণ। সংসারে যত দুঃখ আছে—নরক আছে, কারাগার আছে, অপযশ আছে, অপমান, ব্যাধি, শোক, চিন্তা, ব্যাকুলতা, ঘাবড়ামি, অশান্তি আছে—এই সবই সংসর্গজনিত সুখের প্রতি লোলুপতার ফল।

সুখের লোলুপতার মতো সুখ ততটা বাধক নয়। সুখ লাভ করব, ভোগ করব—এই ইচ্ছা যত বাধক সুখ তত বাধক নয়। তার কারণ বেচারা সুখ আসে, আবার চলে যায় কিন্তু সুখের লোলুপতা যেমনকার তেমনি থেকে যায়। সুখ না থাকলেও লোলুপতা থাকে। সুখভোগের সময়েও লোলুপতা থাকে আবার সুখ চলে গেলেও লোলুপতা থাকে। সুখের প্রতি যে আকর্ষণ থাকে, প্রিয়ভাব থাকে বাস্তবে সেইটিই হ'ল ব্যাধি। এটি দূর করবার সরল এবং শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল অপরের সুখ কিভাবে হবে সেদিকে মন দেওয়া। আপনারা দয়া করে এই কথাটি আজই মনে গেঁথে নিন যে কি করে অন্যের সুখ হবে, অন্যের ভাল কি করে হবে, তার কল্যাণ কি করে হবে, তার আরাম কি করে হবে।

প্রত্যেক কাজে এই চিন্তাই করুন যে অন্যের সুখ কি করে হবে। যদি মনের মধ্যে এই ভাবনা দৃঢ় হয়ে যায় যে অন্যের সুখ কি করে হবে তাহলে নিজের সুখের ইচ্ছা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নিজের সুখ-লোলুপতা দূর করবার জন্য অন্যের সুখ সাধন করতে হবে, গরুদের সুখ বিধান করতে হবে, দরিদ্রদের সুখ দিতে হবে। সকলের সুখ প্রদান করতে হবে। নিজেদের সুখ-লোলুপতা দূর করবার উদ্দেশ্যে যদি সেবা করা যায় তাহলে আমার বিশ্বাস যে অবশ্যই তাতে লাভ হবে। করে দেখুন। আজকাল যাঁরা সেবা করেন তাঁদের মধ্যেও প্রকৃত সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করবার মানুষ খুব কম দেখা যায়। তাঁরা সেবা করেন বটে কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রদর্শন বাতিক থাকে। ভিতর থেকে এই মনোবৃত্তি থাকে না যে অন্যের সুখ কি করে হবে, অন্যের ভাল কি করে হবে। গীতায় বলা হয়েছে যে যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণকর্মে ব্রতী তিনি ভগবানকে লাভ করেন '**তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতে হিতে রতাঃ**' (১২।৪)।

অন্যের সেবা কোন্ রীতিতে করবেন সেকথা এখন বলছি। অন্যের সেবা করবার সময় নিজের মনের প্রাধান্য একেবারেই রাখবেন না, নিজের আগ্রহ বিন্দুমাত্র রাখবেন না। কেবল অন্যের মনের দিকে দেখুন যে সে কি করে প্রসন্ন হবে। কি করে তার সুখ হবে। অনেক বছর পরে আমার মনে এই কথা গেঁথে গিয়েছে যে 'আমার মনের কথাই পূর্ণ হোক'—এইটিই হ'ল কামনা। তাই নিজের মনের কথা ত্যাগ করে অন্যের মনের মতো কাজ করুন। যা ন্যায্য, শাস্ত্রসম্মত, নিজের সামর্থ্যের মধ্যে—অন্যের সেইমতো মনের কথাই পূর্ণ করুন। তাহলে আপনাদের মধ্যে নিজেদের কামনা দূর করবার সামর্থ্য এসে যাবে।

যেখানেই থাকবেন এবং যে ক্ষেত্রেই থাকবেন এই একাগ্রতা রাখবেন যে অন্যের কি করে সুখ, অন্যের কি করে কল্যাণ হবে। এই দিকে খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের দ্বারা যেন কারও ক্ষতি না হয়, সুখই হয়। গোস্বামী তুলসীদাস যেমন বলেছেন—'**কামিহি নারি পিয়ারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম**'। (মানস ৭/১৩০ খ), কামীর কাছে যেমন স্ত্রী প্রিয় আর লোভীর কাছে যেমন অর্থই প্রিয় তেমনি আপনাদের কাছে অন্যের হিত প্রিয় লাগুক। তার পরেই দেখুন কিরূপ অফুরন্ত শান্তি, চটপট কাজ হয়ে যাবে। অনেক বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা করার পর যে কথা আমি জেনেছি সেই কথাই আপনাদের জানালাম।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

ইচ্ছার ত্যাগ ও কর্তব্য পালনে লাভ

শ্রোতা—আপনার আধ্যাত্মিক লাভ কি করে হয়েছে?

স্বামীজী—আমার লাভ হয়েছে সৎসঙ্গ থেকে। আমি সাধনাকে ততটা গুরুত্ব দিই না যতটা দিই সৎসঙ্গকে। অন্যদের জন্যও আমি মনে করি যে তাঁরা যদি মনোনিবেশ করেন গভীরে প্রবেশ করে সৎসঙ্গের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে তাঁদেরও খুব লাভ হবে। একটি বিশেষ কথা বলছি যে আপনারা যদি সৎসঙ্গকে গুরুত্ব দেন এবং তার গভীরে গিয়ে সেটি উপলব্ধি করেন তাহলে আমার যত বছর লেগেছে আপনাদের তত বছর লাগবে না। অনেক তাড়াতাড়ি আপনাদের উন্নতি হবে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে আমি আপনাদের অযোগ্য, অনধিকারী বলে মনে করি না। আপনাদের মধ্যে যে ন্যূনতা আছে তা দূর করবার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আপনাদের আছে। আমার ধারণায় আপনাদের মধ্যে কেবল উৎকণ্ঠারই অভাব রয়েছে। এই উৎকণ্ঠা জাগ্রত হলে আপনারা যদি ভীষণ পাপী হন, ভয়ঙ্কর মূর্খ হন এবং আপনাদের কাছে ন্যূনতম সময় থাকে তাহলেও আপনাদের উদ্ধার হয়ে যাবে। সংসারের প্রতি একাগ্রতা দূর করলেই উৎকণ্ঠা জাগ্রত হবে।

কবীর মনুআঁ এক হ্যায়, ভাবে জহাঁ লগায়।
ভাবে হরি কী ভগতি কর, ভাবে বিষয় কমায়।।

জগতে বস্তু প্রভৃতির সঞ্চয় এবং ভোগে যে আগ্রহ রয়েছে তাকে দূর করলে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সত্যকার আগ্রহ জাগ্রত হবে। এত টাকা-পয়সা হয়েছে, আরও এত হোক; এত সুখ ভোগ হোক, আয়েস-আরাম হোক ; মান বাড়ুক, সম্মান বাড়ুক, নিরোগ হই, সমাজে আমার উঁচু স্থান হোক, আমি এমন হয়ে যাই— এইরকম যত ইচ্ছা সেগুলি ত্যাগ করে দিলে আপনারা প্রকৃত একাগ্রতা লাভ করবেন। যতটা আগ্রহ হওয়া উচিত ততটা না হওয়ার কারণ হ'ল যতটা ত্যাগ করা উচিত ততটা ত্যাগ হচ্ছে না। ত্যাগ কী? গীতা ইচ্ছার ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলেছে। ইচ্ছা কী? 'এমন হওয়া উচিত' আর 'এমন হওয়া উচিত নয়'—একেই বলে ইচ্ছা।

শ্রোতা—ইচ্ছা না করলে শরীরের, আত্মীয়স্বজনদের পালন পোষণ কি করে হবে?

স্বামীজী—পালন-পোষণ ইচ্ছায় হয় না। দয়া করে এটা বুঝুন। কৃপানাথ!

টাকা-পয়সা পাওয়া, বস্তু পাওয়া ইচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না। বস্তু লাভ হয় পূর্ব কর্ম থেকে এবং বর্তমান কর্ম (উদ্যোগ) থেকে। কারণ হ'ল কর্ম এবং বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইচ্ছা এবং বস্তুর মধ্যে এতটুকুও সম্বন্ধ নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারেন যে তিনি অর্থের ইচ্ছা করেননি, তাই তিনি নির্ধন? যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ধনী হয়ে যেতেন। বাস্তবে তা মোটেই নয়। এই কথাটা আপনারা দয়া করে বুঝুন। ইচ্ছার সঙ্গে বস্তুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। বস্তুর সম্পর্ক কর্মের সঙ্গে; কেননা ক্রিয়া এবং বস্তু এই দুটি প্রাকৃত, দুটি একই তত্ত্ব। তাই বস্তুর সম্পর্ক পূর্বকৃত অথবা বর্তমানের কর্মের সঙ্গে আছে। পূর্বকৃত কর্মকে ভাগ্য (প্রারব্ধ) বলে আর বর্তমানের কর্মকে পুরুষার্থ বলে।

ইচ্ছার সঙ্গে পদার্থের সম্বন্ধ একেবারেই নেই। যদি আমি এই ইচ্ছা করি যে আমার পালন পোষণ হয়ে যাক—তাহলে কি সেরকম ইচ্ছার ফলে আমার পালন পোষণ হয়ে যাবে? আপনাদের জানাই যে আপনারা সকলে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ইচ্ছা করুন যে ঐ লোকটির আত্মীয়স্বজনদের পালন পোষণ হোক এবং তাকে একটা পয়সাও না দেন তাহলে কি তার আত্মীয়স্বজনদের পালন পোষণ হয়ে যাবে? মোটেই না। ইচ্ছার সঙ্গে কেবল পরমাত্মার সম্পর্ক আছে। যদি পরমাত্মাকে পাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, প্রচণ্ড অভিলাষ হয় তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে। এর কারণ কী? বস্তুর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদভাব আছে। বস্তু আমাদের থেকে দূরে, চোখ থেকে দূরে, কান থেকে দূরে, ব্যক্তি থেকে দূরে আছে; সেজন্য কর্মের দ্বারাই তা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমাত্মা দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে দূরে নন। যেখানে আমরা 'আমি' বলি সেখানেও পরমাত্মা পরিপূর্ণ রয়েছেন। সেজন্য ইচ্ছা করামাত্র তিনি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মার মতো অর্থ সর্বত্র বিদ্যমান নেই। সেগুলি তো সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু পরমাত্মাকে সৃষ্টি করতে হয় না, তাঁকে কোথাও থেকে আনতে হয় না।

আপনারা বলতে পারেন যে বড় সংসার, খাওয়া পরার কষ্ট, কিছুতেই চলে না। তাহলে ইচ্ছা করা ছাড়া কি করে থাকব? কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি জিনিস পাওয়া যাবে? কাজ করলে তবেই না জিনিস পাওয়া যাবে; তাই বস্তুর ইচ্ছা না করে কাজ করবার ইচ্ছা করুন। নিষ্কর্মা, কুঁড়ে হয়ে থাকবেন না। যা ন্যায্য সেই কাজ করুন। মিথ্যা, কপটতা, বেইমানী, ঠগ, বিশ্বাসঘাতক হবেন না। অন্তঃকরণে টাকা পয়সাকে গুরুত্ব দেবেন না। এই যে লোভ, সংগ্রহ করবার প্রবৃত্তি এইগুলিকে ত্যাগ করুন, তাহলে আপনাদের নতুন ভাগ্য সৃষ্টি হবে,

অর্থাৎ যা আপনাদের ভাগ্যে লেখা নেই সেগুলিও আপনাদের কাছে এসে যাবে। কিন্তু আপনাদের লোভ ত্যাগ করতে হবে এবং এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় করতে হবে যে মরে গেলেও পাপ করবেন না, অন্যায় করবেন না, মিথ্যা কপটতা, জোচ্চুরি করবেন না। যদি মরেও যান তাহলেও তফাৎটা কী হবে? মরতে তো একদিন হবেই, তাহলে পাপের বোঝা নিয়ে কেন মরবেন? পাপের বোঝা না নিয়ে মরলে ক্ষতি কী? পাপ না করলে যদি টাকা-পয়সা না জোটে এবং না খেয়ে মরে যেতেও হয় তাহলেও নরকে যেতে হবে না। যদি পাপ করে বেঁচে থাকেন তাহলে নরকে যেতেই হবে। নরক থেকে বাঁচতে পারবেন না, ব্রহ্মাও বাঁচাতে পারবেন না। অতএব কর্তব্যের ইচ্ছা করুন, নিষ্কর্মা হয়ে থাকবেন না। এই বিষয়ে আমি চারটি কথা বলে থাকি—

(১) নিজের সমস্ত সময় সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উঁচু কাজে লাগান। নিষ্কর্মা থাকবেন না, নিরর্থক সময় নষ্ট করবেন না। তাস-পাশা খেলা, ফালতু ইয়ার্কি তামাসা করা, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, সিনেমা-নাটক দেখা— এগুলি সব বাজে কাজ, তমোগুণের কাজ, যার ফলে অধোগতি (নিচ যোনি এবং নরক প্রাপ্তি) হয় **'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪/১৮)। এইরকম ব্যর্থ কাজে সময় ব্যয় করবেন না। যাতে শরীর নির্বাহ হয়, স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, পৃথিবীর ভাল হয়, পরমাত্মাকে পাওয়া যায় সেইরকম কাজে লেগে থাকুন। (২) যে কোনও কাজই করুন না কেন সুচারুরূপে করবেন যাতে নিজেদের মনেও সন্তোষ হয় এবং অন্যেও বলে যে খুব ভাল কাজ হয়েছে। লেখার কাজ হোক, পড়ার কাজ হোক, কর্মচারীর কাজ, বিক্রেতার কাজ, ক্রেতার কাজ প্রভৃতি সংসারের যে কোনও কাজই করুন না কেন সেগুলি খুবই সুচারুরূপে যথাযথভাবে করবেন। মা-বোনেরা রান্না করলে ভালভাবে করবেন। উপকরণ যেমনই হোক রান্না যেন ভাল হয়। খাদ্য ভালভাবে পরিবেশন করবেন। সকলে কি করে সন্তুষ্ট হবে, কি করে সকলের সুখ হবে এইরকম ভাবনা নিয়ে সব কাজ করবেন।

(৩) এই কথাটি মনে রাখবেন যে আপনাদের কাছে যেন কারও স্বত্ব (অপরের হকের বস্তু) না এসে যায়! আপনাদের স্বত্ব যদি অন্যের কাছে চলে যায়ও কিন্তু অন্যের স্বত্ব যেন একেবারেই আপনাদের কাছে না থাকে।

(৪) নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য সবচেয়ে কম খরচ করবেন। শরীর-নির্বাহের জন্য, খাওয়া-দাওয়ার জন্য, পরিধেয়ের জন্য কম খরচ করুন। সাধারণভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। বিলাস-ব্যসন, সুখ-আহ্লাদ

করবেন না। এইরকম ভাবে থাকলে আপনাদের অভাব হবে না। করে দেখুন না!

আজকাল লোকেরা বলেন কী করব, নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছি, কাজ নেই। এটি একদম বাজে কথা। কেন নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছেন, নাম-জপ করুন, কীর্তন করুন, গীতা-রামায়ণ প্রভৃতি পড়ুন—ঘরেতে ঝাঁট দিন, বাসন ধোন, জুতা পরিষ্কার করুন, নর্দমা, শৌচালয় সাফ করুন। এইরকম কিছু না কিছু করতে থাকুন। করতে চাইলে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। কাজ করলে হৃদয় নির্মল হবে। তাস-পাশা খেলার মতো বাজে কাজের জন্য সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ছুটির দিন হলে এমনই বেকার ঘুরে বেড়াবেন, মিছামিছি ঘুরতে বেরুবেন, সিনেমা দেখবেন, খেলাধুলা করবেন, জল ছিটোবেন, ধাক্কাধাক্কি করবেন—এইভাবে বাজে কাজে সময় নষ্ট করবেন। এই মানব-শরীরের সময় এইভাবে নষ্ট করবার জন্য নয়। তেলির ঘরে যে তেল হয় তা কি ঘটি করে পা ধোবার জন্য।

ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-শরীর দিয়েছেন। এই মানব-শরীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজে নিয়োগ করতে হবে। সময়কে নষ্ট করা খুব বড় ক্ষতি। টাকা-পয়সা আবার সৃষ্টি করা যায়। যৌবনপ্রাপ্ত ছেলে যদি মরে যায় তাহলে যে ছোট বালক আছে সে যুবক হয়ে যেতে পারে। গৃহস্থের বাড়িতে নতুন জন্ম হতে পারে। কিন্তু বয়স (সময়) কোনওভাবেই সৃষ্টি করা যায় না। তা কেবল নষ্টই হয়ে যায়। টাকা-পয়সার তো খুব খেয়াল রাখেন, খুব ভেবে চিন্তে প্রতিটি পয়সা খরচ করেন আর উড়োজাহাজ প্রভৃতি দেখতে চার-পাঁচ মিনিট খরচ করে ফেলেন। তাতে কী লাভ হ'ল? বলুন। এতে স্বাস্থ্য বা সমাজ কার ভাল হ'ল? অর্থ পেলেন, না কি ভগবানকে পেলেন? পেলেনটা কী? সময় রূপী যে প্রকৃত সম্পদ আপনারা পেয়েছেন তাকে কেন নষ্ট করেন? আপনারা যদি সাবধান থাকেন, সময় নষ্ট না করে সর্বোত্তম কাজে লাগান তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকে দু- জায়গাতেই আপনাদের উন্নতি হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনারা যেখানেই যাবেন, আপনাদের উন্নতি হবে। সবচেয়ে বড় নাস্তিকও যদি জেনে বুঝে সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাহলে তার ধারণানুসারে, কর্ম অনুসারে তার উন্নতি হবেই। সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। আর আস্তিক মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার করলে ভগবানকে পাবেন সে-কথা বলবার দরকারই নেই।

অন্যের স্বত্ব আসতে দেবেন না। স্ত্রীর যা অধিকার তা স্ত্রীকে দিয়ে দিন, তাঁর যা অধিকার তা কেড়ে নেবেন না। তাঁর প্রতি আপনার যে কর্তব্য তা পূর্ণরূপে

পালন করুন। ছেলের যা অধিকার তা তাকে দিয়ে দিন। ছেলের প্রতি বাবার যে কর্তব্য তা যথাযথভাবে পালন করুন। মা-বাবা আপনাদের জন্ম দিয়েছেন, পালন-পোষণ করেছেন, শিক্ষিত করেছেন। অতএব তাঁদের প্রতি আপনাদের কর্তব্য পূর্ণত পালন করুন। আপনাদের উপর তাঁদের যে অধিকার আছে তাকে রক্ষা করুন। তাঁদের অধিকার তাঁদের দিয়ে দিন। কু-পুত্র হবেন না। এইভাবেই প্রতিবেশী, ব্যবসায়ী যাদের সঙ্গেই আচার-আচরণ ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকেন তাদের স্বত্ব যাতে আপনাদের ভাগে না এসে যায় এ বিষয়ে সজাগ থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে প্রীতির, সততার সঙ্গে আচরণ করুন। এইভাবে সর্বত্র সাবধান থাকুন। এতসব করলেও সমস্ত ঋণ শোধ হবে না, তবে নতুন ঋণ আর হবে না।

সাবধানতা অবলম্বন করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোথায়, কোথায় আপনারা অন্যের স্বত্ব হস্তগত করছেন। এখন তো অন্যের স্বত্ব কী তা জানতেই পারেন না। এখন তো জিজ্ঞাসা করলে আপনারা বলবেন যে আপনারা তো কারুর স্বত্ব (হক) কেড়ে নেন না। বলবেন, আমরা ঠিক কাজই করি, পাপ কাজ করি না। এমন লোকেরও আমি দেখা পেয়েছি যিনি বলেন ভজন করবার প্রয়োজন কী, আমি তো পাপ করিনি। ভগবানের ভজন সেই করবে যে পাপ করে। তার জ্ঞান নেই, সে জানেই না যে পাপ কী, অন্যায় কাকে বলে। এইজন্য সর্বদা সাবধান থাকবেন যে এখন যে কথা শুনলেন তা জীবনভোর পালন করবেন। আর কখনও গাফিলতি, ভুল করবেন না।

আমি আপনাদের বলেছি যে টাকা-পয়সার, বস্তুর সম্বন্ধ ইচ্ছা বা চিন্তনের সঙ্গে নেই, সেগুলির সম্বন্ধ কর্মের সঙ্গে—এই কথাটি বোঝা খুবই দরকার। আপনারা বলেন যে এইভাবে কি করে কাজ হবে? আমরা গৃহী, কাজ-কর্ম আছে, এইজন্য চিন্তা করতে হয়। তাই 'কি করে কাজ করব, সেবা করব' এইরকম চিন্তা (বিচার) করা দোষের নয়। আমার টাকা-পয়সা হোক, অনেক বস্তু পাই, এইরকম চিন্তাই দোষের।

শ্রোতা—মহারাজ! চিন্তা তো হয়।

স্বামীজী—চিন্তা যদি হয় তাহলে তা ত্যাগ করুন, কাজ করুন, চিন্তা করলে বুদ্ধি নষ্ট হবে—'**বুদ্ধিঃ শোকেন নশ্যতি**'। শান্তিপূর্বক চিন্তা করলে বুদ্ধি বিকশিত হবে। চিন্তা করা এক জিনিস আর বিচার করা অন্য জিনিস। 'কাজ কিভাবে করব, আত্মীয়দের কেমন করে পালন করব, ব্যবসা করব কিভাবে, সকলের সঙ্গে আচরণ কেমনভাবে করব'— শান্ত চিত্তে এইসব কথা বিচার

করুন। বিচার করলে বুদ্ধি বিকশিত হবে। কিন্তু যদি চিন্তা করেন 'হায়! কী করব? এত সব আত্মীয়ের পালন করব কি করে? আদায় নেই, কী হবে?' —তাহলে বুদ্ধি আরও নষ্ট হয়ে যাবে, কাজ করতে বাধা সৃষ্টি হবে, লাভ কিছু হবে না। এইজন্য চিন্তা না করে বিচার করুন, উদ্যোগী হন, পুরুষার্থ করুন, নিষ্কর্মা থাকবেন না। সৎসঙ্গ করুন, বই পড়ুন এবং স্বয়ং বিচার করুন অথবা পরস্পরের সঙ্গে বিচার-বিনিময় করুন।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

সেবার মহত্ত্ব

পরমাত্মতত্ত্ব এমনই যে, যে যা চাইবে সে তাই পাবে। ধন, সম্পদ, বৈভব, মান, সম্মান, আরোগ্যলাভ প্রভৃতি যে চাইবে সে ঐগুলি পেয়ে যাবে এমন কথা নয়। ধনসম্পদ প্রভৃতি সবাই পেতে পারে না, পেলেও অল্পস্বল্প পাবে, সবাই সমান পাবে না। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব সবাই পাবে, সবাই সমান পাবে এবং যে চাইবে সেই পাবে; কেননা তার সঙ্গে সকলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জীব পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। এইজন্য পরমাত্মার উপর জীবের পূর্ণ অধিকার আছে। যেমন, মায়ের উপর সব শিশুরই অধিকার, সব শিশুই তাদের মায়ের কোলে যেতে পারে। এইরকম পরমাত্মা সকলের মা-বাবা— **'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব'**। তিনি চিরকাল সকলের মা-বাবা রয়েছেন এবং চিরকাল থাকবেন। সেজন্য তাঁকে পেতে কোনও মানুষই অযোগ্য নয়, অনধিকারী নয়, দুর্বল নয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে কারও হতাশ হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কত বড় কথা!

আমি যেসব বই পড়েছি, শুনেছি, বিচার করেছি তাতে আমার মধ্যে এই কথা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে যে কোনও বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা, ক্রিয়া প্রভৃতির মহিমা নেই, বরং সেগুলির সদুপযোগে মহিমা আছে। আমাদের বুদ্ধি যেমনই হোক, পরিস্থিতি, অবস্থা যেমনই হোক, যোগাযোগ যাই হোক তার সঠিক সদুপযোগ হলে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তার কারণ হ'ল, মনুষ্যজন্ম এইজন্যই লাভ হয়েছে।

কবহুঁক করি করুণা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী।।

(মানস ৭।৪৪।৩)

অহেতুক কৃপাদানকারী প্রভু কৃপা করে মনুষ্য-শরীর দিয়েছেন, তাহলে ভগবানের কৃপা কি বিফল হবে? ভগবানের কৃপা কখনও বিফল হয় না। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে ভগবান মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্য সে যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারে। চাইলে এর সদুপযোগ করে সে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে পারে, নিজের কল্যাণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে সে এর দুরপয়োগ করে চুরাশি লক্ষ যোনিতে অথবা নরকে যেতে পারে। বাস্তবে ভগবান এই স্বাতন্ত্র্য মানুষকে তার কল্যাণের নিমিত্তই দিয়েছেন। অতএব মানুষ কী করবে? তার মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি হোক যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কি করে হবে? রামায়ণে আছে—

এক বানি করুণানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী।।

(মানস ৩/১০/৪)।

ভগবানের একটি স্বভাব, একটি প্রকৃতি হ'ল যে যার ভগবান ছাড়া আর কোনও সহায় নেই ভগবানের কাছে সে খুব প্রিয়। এইজন্য ভগবান অর্জুনকে সমগ্র গীতা শুনিয়ে বলেছিলেন—'**মামেকং শরণং ব্রজ**' (১৮/৬৬), তোমার পক্ষে যদি আর কিছু করা সম্ভব না হয় তাহলে আমার শরণ নাও। '**মাম্ একম্**'— এর অর্থ এই নয় যে ভগবান অনেকগুলি এবং তাঁদের মধ্যে একজনের শরণ নিতে হবে। বস্তুত এখানে এর অর্থ হ'ল—অনন্য শরণ। অর্জুন বলেছিলেন— আমি ধর্ম নির্ণয় করতে পারছি না— '**ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ**' (২/৭), তাতে ভগবান বললেন যে ধর্ম নির্ণয় করবার প্রয়োজন তোমার নেই, তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে এক আমার শরণ নাও— '**সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**' (১৮/৬৬)। অতএব 'হে নাথ! আমি আপনার এবং আপনি আমার। সংসারের কোনও বস্তু, কোনও প্রাণী আমার নয় আর আমিও কারও নই'—এইভাবেই ভগবানের শরণাগত হও।

এখানে একটি কথা বুঝতে হবে। সেটি হ'ল, সংসারের লোকেরা (মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি) আপনাদের কাছে যদি ন্যায় আশা করে থাকেন আর আপনারা তা যদি পূর্ণ করতে পারেন তাহলে সেই আশা আপনারা পূর্ণ করে দিন, অর্থাৎ তাঁদের সেবা করুন। কেবলমাত্র সেবা করবার জন্যই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখুন। সংসারের কাছ থেকে পাবার জন্য সম্বন্ধ রাখবেন না। কেননা সংসারের কোনও বস্তুই স্থায়ী নয় আর আপনারা স্থায়ী। তাই সংসারের কোনও জিনিসই আপনাদের সঙ্গে থাকবে না। এইজন্য শারীরিকভাবেই হোক, দেশের সম্পর্কেই হোক অথবা অন্য যে কোনও সম্পর্কেই হোক

যাঁদেরই আপনাদের আত্মীয়-কুটুম্ব বলা হয় তাঁদের সেবা করুন। কারণ আপনাদের কাছে যেসব জিনিস আছে সেগুলি তাঁদের, তাঁদের অধিকারভুক্ত। তাঁদের অধিকারের জিনিস তাঁদের দিয়ে দিন। তাঁদের কাছ থেকে যদি পাবার ইচ্ছা করেন তাহলে আপনারা তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে যাবেন। ঋণী হলে মুক্তি হবে না, কল্যাণ হবে না। তাঁদের সেবা করলে কল্যাণ হবে। তাই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল তাঁদের সেবার জন্যই থাকে, নিজেদের প্রয়োজনে থাকে না। সেবা করবার জন্য যদি সম্পর্ক বজায় রাখেন তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হবে। আত্মীয়েরা তখনই অসন্তুষ্ট হন যখন আমরা তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিতে চাই। যদি তাঁদের কাছে অধিকারের কথা না মনে করে কেবল তাঁদের সেবা করতে চান তাহলে কেউ আর অসন্তুষ্ট হবে না। তাই এইটিই হ'ল সংসারে থাকার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং মুক্তির উপায়ও এইটিই। দুটি হাতে নাড়ু—**'দুহুঁ হাথ মুদ মোদক মোরেঁ'** অর্থাৎ সংসারও সন্তুষ্ট হ'ল আর পরমাত্মাও প্রসন্ন হলেন, তাতে নিজেরও কল্যাণ।

আপনাদের লক্ষ্য যদি কেবল পরমাত্মাকে লাভ করাই হয় তাহলে পরমাত্মার শরণাগত হন। সংসারের আশ্রয় ছেড়ে দিন। নিজেদের সামর্থ্যানুসারে সংসারের সেবা করুন। সেবা করলে সংসার সন্তুষ্ট হবে আর প্রভুর চরণে আশ্রয় নিলে তিনি প্রসন্ন হবেন। তাতে নিজে থেকেই আমাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। নিজেদের কল্যাণের জন্য আর নতুন করে উদ্যোগ নিতে হবে না। কত সরল এবং সহজ কথা।

নেওয়ার ইচ্ছা থেকে সংসারের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যুক্ত হয় আর দেবার ইচ্ছা থেকে সম্বন্ধ দূর হয়—এটি খুবই মার্মিক কথা। নেওয়ার ইচ্ছা থেকে সৃষ্ট সম্বন্ধ বন্ধনকারী আর দেওয়ার ইচ্ছা থেকে সৃষ্ট সম্বন্ধ মুক্তিদায়ী। সেইজন্য সেবা করবার উদ্দেশ্যেই সম্বন্ধ তৈরি করুন, সেবা পাওয়ার জন্য নয়। যেমন, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি মেলা মহোৎসবে সকলের জন্য ব্যবস্থা করে থাকে, সকলের সেবা করে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা করায়। মরে গেলে তার সৎকার করে, কিন্তু কান্নাকাটি করে না। যেখানে সম্বন্ধ কেবল সেবা করার সেখানে কান্নাকাটি হয় না। যেখানে কিছু না কিছু পাবার আশা নিয়ে সম্বন্ধ যুক্ত হয় সেখানেই কান্নাকাটি হয়ে থাকে। পাবার ইচ্ছাই হ'ল গুণাবলীর আসক্তি, যার ফলে জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে—

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য যদসদ্যোনিজন্মসু।। (গীতা ১৩/২১) সেবা করবার মনোভাব নির্লিপ্ততা নিয়ে আসে। নিজের ধর্ম, কর্তব্য পালন করলে, অপরের

সেবা করলে বৈরাগ্য আসবে। 'ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যানা' (মানস ৩/১৬/১)। যেমন স্বায়ম্ভুব মনু নিজের কোনও স্বার্থ না রেখে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেছিলেন, তাদের হিতসাধন করেছিলেন। তাতে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য উদিত হয়েছিল—

হোই ন বিষয় বিরাগ ভবন বসত ভা চৌথপন।
হৃদয়ঁ বহুত দুখ লাগ জনম গয়উ হরিভগতি বিনু।।

(মানস ১।১৪২)।

বৈরাগ্য হলে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বনে চলে গিয়েছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য রাজত্ব করেছিলেন, সেজন্য তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য এসেছিল। তিনি যদি তাঁর নিজের জন্য রাজত্ব করতেন তাহলে তাঁর বৈরাগ্য হোত না। যেখানে পাওয়ার ইচ্ছা থাকে সেখানে অনুরাগ সৃষ্টি হয়। রাগ অজ্ঞানের চিহ্ন। অজ্ঞানের পরিচয় হ'ল—'**রাগো লিঙ্গমবোধস্য**'। যে অনুরাগ যুক্ত সে অজ্ঞানী।

সেবা করলে তারই সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়, যে সেবার বদলে কিছু পেতে চায় এবং সেই পেতে চায় যে শরীর এবং বস্তুর সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' সম্পর্ক রাখে। যার মধ্যে নিজেকে সেবক রূপে পরিচিতিরও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, বরঞ্চ কি করে অপরের সুখ হবে, আরাম হবে, কি করে তার কল্যাণ হবে, ভাল হবে—কায়মনোবাক্যে যিনি তার জন্য চেষ্টা করেন, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পদ, অধিকার দিয়ে সকলের সুখ বিধানে সচেষ্ট হন, তিনি মুক্ত হয়ে যান। যেমন, জলের মধ্যে থেকে যদি জলকে নিজেদের দিকে টেনে আনেন তাহলে ডুবে যাবেন, আর হাত-পা দিয়ে যদি মারতে থাকেন তাহলে পার হয়ে যাবেন। তেমনি এই সংসার সমুদ্রে যিনি পেতে চান তিনি ডুবে যাবেন। আর যিনি কেবল দিতেই চান তিনি কখনও ডুবে যাবেন না।

ভগবান এবং তাঁর ভক্তেরা (সাধু-মহাত্মারা) বিনা কারণে সকলের সেবা করে থাকেন—

হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী।।

(মানস ৭।৪৭।৩)

এইজন্য তাঁরা আবদ্ধ হন না। তাঁরা বাঁধবেন কেন, তাঁদের তো দর্শনেই মুক্তি হয়ে যায়। কারণ হ'ল, তাঁদের মধ্যে স্বার্থ নেই, কারও কাছ থেকে কিছু পাবার নেই, প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও নেই। সেইজন্য সেবা করলে বন্ধন হয় না।

শ্রোতা—ভরতমুনি দয়া করে হরিণশিশুকে পালন করেছিলেন। ফলে পরজন্মে তিনি হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন, এমন কেন?

স্বামীজী—প্রথমে ভরতমুনির উদ্দেশ্য ছিল সেবা করা। পরে হরিণশিশুর প্রতি তাঁর মোহ পড়ে গিয়েছিল। ক্রমে হরিণশিশুর প্রতি তাঁর মোহ এত বেশি হয়েছিল যে কখনও তাঁকে দেখতে না পেলে তিনি এমন ব্যাকুল হয়ে যেতেন যেমন পুত্র শোকে মানুষ ব্যাকুল হয়। হরিণশিশুটি এইরকম করে খেলা করে, এইভাবে কোলে আসে, কথা বলে, দেহ চুলকায়, লাফায়—এইরকম চিন্তাতেই তিনি মগ্ন থাকতেন। এই মোহের জন্যই তাঁকে পরবর্তী জীবনে হরিণ হতে হয়েছিল, দয়ার জন্য নয়। দয়া থেকে তাঁর মোহ জন্মায়নি, জন্মেছিল ভুল থেকে। বাস্তবে মোহ প্রথম থেকেই ছিল, তা দয়ার রূপ ধারণ করে এসেছিল। মোহের জন্যই বন্ধন হয়। দয়া পরবশ হয়ে সেবা করলে বন্ধন হয় না।

আশি, নব্বই, কিংবা একশ বছরের লোক মরে গেলে তার জন্য দুঃখ হয় না, কিন্তু পঁচিশ বছরের যুবক মারা গেলে দুঃখ হয়। এর কারণ কী তা একটু চিন্তা করুন। বয়স্ক মানুষ বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ হন, তিনি শিক্ষিতও হন আর তাই তাঁর কাছ থেকে বেশি লাভ হতে পারে; তবু তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ এইজন্যই হয় না যে তাঁর কাছ থেকে কিছু পাবার ইচ্ছা থাকে না। ভেতরে এই ভাব থাকে যে তাঁর কাছ থেকে এখন আর কিছুই পাবার নেই, তাই তাঁর এখন মৃত্যু হলে কোনও আপত্তি নেই। আমি নিজের লোকেদের মুখ থেকে শুনেছি যে বৃদ্ধের মৃত্যু বিবাহের মতো। এইরকম কুড়ি বছরের কোনও মানুষ যদি পাঁচ-সাত বছর ধরে ব্যাধিগ্রস্ত থাকে আর সব ডাক্তার বৈদ্য জানিয়ে দেন যে তার বেঁচে থাকার কোনও সম্ভবনা নেই এবং পঁচিশ বছর বয়সে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলেও তার মৃত্যুতে দুঃখ হয় না। কারণ দুঃখ তখনই হয় যখন তার সঙ্গে কিছু না কিছু স্বার্থের সম্পর্ক থাকে, সেবা পাবার আশা থাকে। এই আশাই বন্ধন সৃষ্টিকারী। যিনি আশা করেন না তাঁর বন্ধন হয় না, তাঁকে কেউ বাঁধতে পারে না।

কোনও আত্মীয় মারা গেলে তাঁর শ্রাদ্ধ করা হয়, দান-ধ্যান করা হয়। এর তাৎপর্য তাঁর কাছ থেকে যা নিয়েছি সেই ঋণ শোধ হয়ে যাক। তাঁর কাছ থেকে যত সুখ পেয়েছিলাম তাই স্মরণে আসে, তাঁর বিচ্ছেদে ততটাই দুঃখ হয়। ছোট শিশুকে কোলে করে তাকে আবদার করে যে সুখ পাওয়া গিয়েছে তার পরিণামেও দুঃখ হবে। সাংসারিক সুখের পরিণাম দুঃখই। সাংসারিক সুখ হ'ল দুঃখের মূল। সেই সুখ নিলে বন্ধন হবেই। যদি সেই সুখ না নেন, বরং সুখ দেন তাহলে কারও সাধ্য নেই যে আপনাকে বাঁধবে। যেখানে কিছু না কিছু স্বার্থ থাকে, মনে সুখ, আরাম, মান, সম্মান ইত্যাদি পাবার ইচ্ছা থাকে সেখানেই

বন্ধন। ব্যাখ্যান দিতে দিতে আমার অনেক বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু বন্ধনের মূল কোথায় প্রথম দিকে এটির খেয়াল হয়নি। পরে বুঝতে পেরেছি যে মনের মধ্যে কিছু পাবার ইচ্ছাই হ'ল বন্ধনের মূল। এটি এমনই দুর্লভ কথা! সংসারের কোনও জিনিস দেখে যদি ভাল লাগে তো সেটিও সুখ ভোগ, যা বন্ধন সৃষ্টিকারী। অনুকূলতার ইচ্ছা করলে দুঃখ আসবেই। এইজন্য সর্বদা সাবধান থাকবেন যে কারও কাছ থেকে সুখ নেব না, আরাম নেব না, মান-সম্মান নেব না। আমাদের কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নেই। যেখানে নেবেন সেখানেই ফেঁসে যাবেন। কেবল দিয়ে যেতে হবে। কেবল সেবা করে যেতে হবে। সেবা করলে পুরানো ঋণ শোধ হয়ে যাবে আর পাওয়ার ইচ্ছা না করলে নতুন ঋণ হবে না। তাহলে আমরা মুক্ত হয়ে যাব।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

বিকার থেকে কি করে মুক্ত হব?

যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের মনে এই কথাটি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে যে সৎসঙ্গ তো আমরা করি কিন্তু তা জীবনে তেমন কার্যকর হয় না। এই কথা আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন। যাকে আপনারা কাজে আসা মনে করেন বাস্তবে তা আপনাদের ভ্রম। ভ্রম হ'ল এই যে আপনারা সেই জ্ঞানকে অসতের উপরে প্রয়োগ করতে চান কিন্তু বাস্তবে আপনাদের অসৎ থেকে উপরে উঠতে হবে। মনে তো করেন যে আপনারা অসৎ থেকে উপরে উঠছেন, কিন্তু পরীক্ষা করেন অসতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। অসৎ (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি)—থেকে তো বিকার সৃষ্টি হতে থাকে, আর আপনারা সেই বিকারগুলিকে নিজেদের স্বরূপে ঘটছে বলে মনে করেন আর বলেন যে কথাগুলি জীবনে ধারণ হচ্ছে না।

আপনারা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। আপনাদের মধ্যে কোন বিকার নেই। কিন্তু আপনারা ভ্রমবশত অসৎ-এর সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' এই সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ নশ্বর শরীরটাকে 'আমি' আর বিনাশশীল বস্তুকে 'আমার' মেনে নিয়েছেন। এইভাবে অসৎ-এর সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার'-ভাব জুড়ে নিলে অসৎ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। অসৎ কখনও নির্বিকার থাকতে পারে না। অসৎ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করলে আপনারা অসৎ থেকে

যে বিকারগুলি হয় সেগুলিকে নিজেদের বলে মানতে থাকেন আর বলতে থাকেন যে সৎসঙ্গের কথা কাজে আসে না।

বিকার তো আসে এবং চলে যায়। কিন্তু আপনারা যেমনকার তেমনই থেকে যান। অতএব আপনারা নিজেদের স্বরূপে স্থিত হন, মনগড়া আমি-ভাবে স্থিত হবেন না। নিজস্বরূপে স্থিত হলে আপনারা সুখ-দুঃখে সম অর্থাৎ নির্বিকার হয়ে যাবেন—'**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ**' (গীতা ১৪/২৪)। এইভাবে সৎসঙ্গে যেসব কথা শুনেছেন তা আপনাদের কাজে আসবে।

যে স্বরূপে স্থিত না হয়ে প্রকৃতিতে স্থিত হয় সেই প্রকৃতিজনিত গুণের, সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়ে যায়—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজানগুণান্‌।।

(গীতা ১৩/২১)

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।

(গীতা ১৩/২০)

'আমি' এবং 'আমার'—এই হ'ল প্রকৃতি, মায়া—'**ম্যায় অরু মোর তোর তৈঁ মায়া**' (রামচরিতমানস ৩/১৫/১)। এই মায়াকে ধরে রেখে বলেন যে কথা কাজে আসে না। মায়াকে ধরে রাখলে তো বিকার সৃষ্টি হবে। এইজন্য আপনারা সাবধান থাকুন। বিকারগুলিকে আপনার নিজস্ব বলে মনে করবেন না।

যা কিছু দৃষ্ট হয়, তা সবই প্রকৃতির। অতএব নিজস্ব বলে কিছু নেই। কেবল প্রভুই হলেন আপনার, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের স্বরূপ সৎ। সৎ-এর কখনও অবিদ্যমানতা হয় না, তাতে কখনও ন্যূনতা আসে না আর কমতি না হওয়ায় আমাদের মধ্যে কোনও কামনা উৎপন্ন হয় না। অতএব নিজেদের জন্য কিছু চাইবেন না। নিজেদের জন্য কিছু করবারও নেই। আপনাদের স্বাভাবিক স্থিতি হ'ল সৎ-এ আর স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে অসৎ-এ। সেই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে আমরা মিশে যাই আর সেই ক্রিয়াগুলিকে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিই। এটি ভুল। এইজন্য আমাদের বিবেক যেন পরিস্কার থাকে যে কিছুই আমাদের নয়, আমরা কিছু চাই না এবং আমাদের কিছু করতেও হবে না। পুরাতন অভ্যাসবশত যদি অসৎ-এর সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ দেখাও যায় তাহলে একটু থেমে বিচার করুন যে এটি তো জানার মধ্যে আসছে আর আমি একে জানি। 'জানবার জিনিস' আর 'যে জানে' দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা যখন থামকে দেখি তখন থাম কি আমাদের মধ্যে এসে যাবে?

থাম তো জানবার মতো এক বস্তু। যা জানার জিনিস তা যে জানে সেটি হয়ে যায় না।

যাকে 'এই' বলা হয় সে 'আমি' হতে পারে না—এইটিই নিয়ম। 'এই' তো এই-ই থাকবে। ভগবান শরীরকে 'এই' বলেছেন—**'ইদং শরীরম্'** (গীতা ১৩/১)। অতএব এই শরীর 'আমি' কি করে হতে পারে? শরীর 'আমার'-ও হতে পারে না, কেননা আমরা স্বয়ং ভগবানের অংশ। **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫/৭) আর শরীর, ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির অংশ—**'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি'** (গীতা ১৫/৭)। অতএব শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করা ভুল। যত বিকার হয় সবই মনে, বুদ্ধিতে, ইন্দ্রিয়গুলিতে হয়। স্বয়ং-এতে কখনও বিকার হয় না। বিকার হয় আবার চলে যায়—এ তো আপনারা জানেন। আসা-যাওয়া করা বিকার আপনাদের মধ্যে কি করে আসবে? এই কথাটি দৃঢ়নিশ্চয় করুন যে আমি অবস্থানকারী আর এইসব বিকার হ'ল সঞ্চারী। বিকারগুলিকে সঞ্চারী এবং অনিত্য জেনে নিয়ে সহ্য করুন অর্থাৎ নির্বিকার থাকুন—**'আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব'** (গীতা ২/১৪)।

নিয়ম হ'ল এই যে সংসারের সঙ্গে মিশে গেলে সংসারের জ্ঞান হয় না আর পরমাত্মা থেকে আলাদা থাকলে পরমাত্মার জ্ঞান হয় না। সংসার থেকে আলাদা থাকলেই সংসারের জ্ঞান হবে এবং পরমাত্মা থেকে অভিন্ন হলে পরমাত্মার জ্ঞান হবে। এইজন্য যদি অসৎ-এর সঙ্গে মিশে যান তাহলে না সৎ-এর জ্ঞান হবে, না অসৎ-এর জ্ঞান হবে। কারণ হ'ল প্রকৃতপক্ষে সংসারের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা আছে আর পরমাত্মার সঙ্গে আছে আমাদের অভিন্নতা।

শ্রোতা—অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তো জ্ঞান হয়ে যাবে?

স্বামীজী—অন্তঃকরণ শুদ্ধ করতে কে বারণ করছে? কিন্তু ভাই, শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণ তত তাড়াতাড়ি শুদ্ধ হবে না যত তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলে হবে। কারণ হ'ল, অসৎ (অন্তঃকরণ) এর সত্তা মেনে নিয়ে যদি আপনারা তাকে শুদ্ধ করতে চান তো তাতে অনেক সময় লাগবে, আর তা হবেও না। যদি অসৎ-এর সত্তা না মেনে তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে নেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে।

ভগবান বলেছেন—**'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে'** (গীতা ১৩/১) অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটিই শরীর 'ইদম্' হওয়ায় নিজস্বতা থেকে আলাদা এবং ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। **'এতদ্যোবেত্তি তং প্রাহুঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞং ইতি তদ্বিদঃ'** (গীতা ১৩/১) সেই ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টি ক্ষেত্রের দিকে

না হয়ে যেন ভগবানের দিকে হয়ে যায়। **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** (১৩/৩)। ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে যতটা শুদ্ধি হবে অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার চেষ্টায় ততটা শুদ্ধি হবে না। আপনারা পরমাত্মার কাছ থেকে যতটা অভিন্ন থাকবেন আপনাদের মধ্যে স্বাভাবিক শুদ্ধি ততটা হবে। মনে, ইন্দ্রিয়গুলিতে, শরীরে, আচরণে, সবেতেই স্বতঃই শুদ্ধি হবে। তার কারণ আপনারা সৎ-এর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছেন, মূল জিনিসটিই ধরেছেন। তখন এর মধ্যে কঠিনতা কোথায় ? খুবই সহজ সরল কথা।

আপনারা সঞ্চারমান অসৎ বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে নিজস্ব সৎ স্বরূপে স্থিত হন। যখন আপনারা অসৎবস্তুগুলি থেকে সুখ গ্রহণ করতে থাকেন তখন অসৎ-এর সঙ্গলাভ হয়। অসৎ-এর সঙ্গ লাভ করার পর আপনারা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করতে জোর দেন আর মনে করেন যে ঠিক করছেন—এটি হ'ল বাধা এটিই অসামর্থ্য। জোর দেওয়ার পরেও যখন কাজ হয় না তখন হতাশ হয়ে বলেন যে ভাই, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। না হবার কারণ আপনারা অসৎ-কে আঁকড়ে রেখেছেন। অসৎ-কে যদি আঁকড়ে না থাকেন তাহলে নিজ স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, যেমনকার তেমনি।

শরীর ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রকৃতিতে স্থিত রয়েছে—**'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি'** (গীতা ১৫/৭)। এইগুলির সঙ্গে আপনারা সেই সৎ-কে আনতে চান আর যখন তা আসে না তখন বলেন যে সৎসঙ্গের কথা আপনাদের আচরণে আসে না, আপনাদের প্রয়োগে আসে না। অসৎ (অন্তঃকরণ)-কে আপন মনে করে তাকে শুদ্ধ করতে চাইলে সে শুদ্ধ হবে কি করে ? কেননা তাকে আপন মনে করাই হ'ল অশুদ্ধি। মমতাই হ'ল মল—**'মমতা মল জরি জাই'** (রামচরিতমানস ৭/১১৭ক)। মল দিয়ে শুদ্ধ করতে চাইলে কি করে শুদ্ধ হবে ?

এই কথাগুলি শোনার পর আপনাদের মধ্যে এই শক্তি আসা উচিত যে আর আমরা এই ভুল করব না। কেননা এখন আমরা এটিকে ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি। অসৎ-কে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মেনে নিয়েছিলাম, মূলে এখান থেকেই ভুল হয়েছিল। মূল ভুল এইটিই। এই ভুলকে দূর করে নিজের নির্বিকার স্বরূপে স্থিত হয়ে যান। যতক্ষণ না ভুল দূর হয় ততক্ষণ শান্তি যেন না আসে। ছোট শিশু সর্বদা মায়ের কোলে থাকতে চায়। কোল থেকে নামালেই সে কাঁদতে শুরু করে। আপনারাও সবসময় সৎ (ভগবান)-এর কোলে

থাকুন। অসৎ-এ গেলেই এই বলে কাঁদতে শুরু করুন, আরে! কী হ'ল। আমরা তো কোলেতেই থাকব। তাহলে অসৎ-এর সম্বন্ধ সহজেই দূর হবে।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছাই বড় বাধা

ভোগ এবং সংগ্রহ—এই দুটির প্রতি যতক্ষণ মানুষের আসক্তি থাকবে ততক্ষণ 'ভগবানকে লাভ আমাকে করতে হবে'— এমন সিদ্ধান্তও করা যায় না, ভগবানকে লাভ করা তো দূরের কথা—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।

(গীতা ২/৪৪)

যতক্ষণ পর্যন্ত ভোগ এবং সংগ্রহে আসক্তি থাকে অর্থাৎ সাংসারিক বস্তুসমূহ থেকে সুখ পেতে থাকেন এবং টাকা-পয়সা সংগ্রহ করার বাসনা মনের মধ্যে বসে থাকে ততক্ষণ চেষ্টা করলেও পরমাত্মাকে জানতে পারবেন না।—**'যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'** (গীতা ১৫/১১।) তার কারণ হৃদয়ে পরমাত্মার বদলে ভোগ এবং অর্থ অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।

সংসারের সুখ ভোগ করতে হবে এবং সুখভোগের জন্য সংগ্রহ আবশ্যক—ভোগ এবং সংগ্রহের এই রুচি খুবই ঘাতক। ধনের ব্যবহার তো ব্যয় করাতেই তা নিজের জন্যই হোক অথবা অন্যের জন্যই হোক। কিন্তু ধন সঞ্চয় করে রাখা কোনও কাজের নয়। বস্তু ও অর্থ সংগ্রহের তো কোনও কথাই নেই, 'অনেক অধ্যয়ন করব, অনেক শাস্ত্রপাঠ করব'— এই (বিদ্যা সংগ্রহের) ভাবনা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পরমাত্মতত্ত্ব জানতে পারবেন না। জানার সঙ্কল্পও করতে পারবেন না। যে নিজের কল্যাণ চায় তার বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়—**'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকা'** (গীতা ২/৪১)। আমাকে কেবল পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে— এই সঙ্কল্প করাই হ'ল বুদ্ধির একনিষ্ঠ হওয়া। কিন্তু যারা ভোগ আর সংগ্রহে আসক্ত তাদের বুদ্ধি অনন্ত এবং প্রত্যেকটি বুদ্ধির শাখাও অনন্ত—**'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ-বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্'** (গীতা ২/৪১)। যেমন, পুত্র লাভ— এটি হ'ল একটি বুদ্ধি আর কি করে পুত্র লাভ হবে, কোন্ ওষুধ সেবন করব অথবা কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করব, কিংবা কোন্ সাধুর আশীর্বাদ

নেব ইত্যাদি, এইগুলি সেই বুদ্ধির শাখা। এইরকম, ধন লাভ হ'ল একটি বুদ্ধি, আর কি করে ধন লাভ হবে, ব্যবসা করব, না চাকরী করব, চুরি করব, না কি ডাকাতি করব, ঠকাব, না কাউকে ধোঁকা দেব প্রভৃতি চিন্তাগুলি হ'ল তার শাখা। অনুরূপভাবে সম্মান লাভের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে তা কি করে পাওয়া যাবে, বক্তৃতা দিয়ে, নাকি সাংসারিক সেবা করে ইত্যাদি নানারকম শাখা সৃষ্টি হয়। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম। এইভাবে ভোগ এবং সংগ্রহে আসক্ত মানুষেরা পরমাত্মপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কখনও সৎসঙ্গ করার ফলে তাদের মনে পরমাত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা যদি জাগে তাহলেও তারা তাতে টিকে থাকতে পারবে না।

গীতায় ভগবান পরমাত্মপ্রাপ্তির এক সিদ্ধান্তের খুব মহিমা বর্ণনা করেছেন। **'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্'** (গীতা ৯।৩০)— যে আপাদমস্তক, দুরাচারী, যার দুরাচারে কোনও কমতি নেই, যে মিথ্যা, কপটতা, বেইমানী, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, বেশ্যাগমন, জুয়া, চুরি, ব্যভিচার, প্রভৃতি যত পাপাচার আছে তাতে লিপ্ত। এইরকম মানুষও যদি ভগবানের ভজন করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প-বদ্ধ হয় তাহলে ভগবান বলেন যে তাকে সাধু বলে গণ্য করা উচিত—**'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'**। ভগবান তাকে সাধু বলে মেনে নিতে আদেশ করেছেন। কারণ সে পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে সঙ্কল্পবদ্ধ—**'সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ'**। তার এই একটি লক্ষণ নির্দিষ্ট যে এখন যা কিছু হোক, ভগবানের দিকেই শুধু যেতে হবে।

এখানে একটি সংশয় উৎপন্ন হয়। তা হ'ল, যে ভোগ এবং সংগ্রহে আসক্ত তার তো পরমাত্মপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত হতে পারে না আর সবচেয়ে বড় পাপীও এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে এই দুটি কথা তো পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, কেননা পাপীকে ভগবান **'অপি চেৎ'** অভিধা দিয়েছেন। তাৎপর্য হ'ল, যদিও পাপী ভগবানের ভজন করে না—**'পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব না কাউ'**।। (মানস ৫/৪৪/২), **'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ'** (গীতা ৭/১৫), তবুও যদি সে ভগবানকে ভজনা করতে চায় তো তা করতে পারে। ভগবানের দিক থেকে কারও প্রতি নিষেধ নেই। সেইজন্য পাপীও যদি ভগবানকে ভজনা করবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তাকে সাধু বলে মেনে নেওয়া উচিত। এর কারণ, বাস্তবে ভগবানের অংশ হওয়ায় জীব শুদ্ধ, নির্দোষ। সংসারের প্রতি আসক্তির জন্য তার মধ্যে দোষ এসে যায়। যদি সে সংসারের আসক্তি দূর করে তাহলে তার শুদ্ধ স্বরূপই কেবলমাত্র রয়ে যাবে। আজকাল পারমার্থিক কথা বললে এবং

শুনলেও ভগবানের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত হয় না — তার কারণ হৃদয়ে অর্থের গুরুত্ব স্বীকৃত। বাস্তবে টাকা-পয়সা ততটা বাধক নয়, যতটা ভোগের প্রতি আসক্তির গুরুত্ব বোধ। প্রকৃত অর্থে ভোগও তত বাধক নয় যতটা ভোগের প্রতি আসক্তি বোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে বস্তুসমূহের, মান-মর্যাদার, সম্মান-সৎকারের, নীরোগতার, শরীরের আরামের প্রতি গুরুত্ব বোধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরমাত্মপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে যতই কথা বিস্তার করুক, যত বড়ই পন্ডিত হোক, বাইরে সে যতই বৈরাগী, ত্যাগী হোক, কিন্তু মনে যতক্ষণ মান-মর্যাদা, সুখ-আরাম, কীর্তির ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ সে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারবে না। কেননা যেখানে পরমাত্মার প্রতি রুচি হওয়া উচিত সেখানে ভোগ এবং সংগ্রহের প্রতি রুচি হয়ে গিয়েছে। ভোগ এবং সংগ্রহের দ্বারা তার চিত্ত অপহৃত হয়ে গিয়েছে—**'অপহৃত চেতসাম্'** (গীতা ২/৪৪)। তার চিত্তের অপহরণ হয়ে গিয়েছে! সেই বেচারির সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। তার কাছে যে শক্তি ছিল তা ভোগ আর সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কিন্তু সে কিছুই পাবে না। একটা কানা কড়িও পাবে না। কেবল বঞ্চনাই পাবে। পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সে রিক্ত থেকে যাবে। মান-সম্মান কত দিন থাকবে, আর তা পেয়েই বা হবে কি? কতদিন ভোগ করবে? সংগ্রহ কত দিন হবে? এখানে সংগৃহীত ধন এখানেই থেকে যাবে আর আয়ু ফুরিয়ে যাবে।

যদি পরমাত্মাকে লাভ করতে চান তাহলে ভোগ এবং সংগ্রহে গুরুত্ব দেবেন না। আজকাল তো অর্থের চেয়ে তার সংখ্যাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়—আমি লাখপতি হব, কোটিপতি হব, এত বেশি সংগ্রহ করব। কাছে যত টাকা আছে তা খরচ করা হয় না, সংখ্যা কমে যাবে বলে। নিজের ছেলেদের শেখান হয় যে যতটা রোজগার করবে তা থেকেই খরচ করবে, মূলধন ভাঙ্গবে না। মূলধনে যেন কোনও ঘাটতি না হয়, তা থেকে খরচ করবে না। কেউ যদি পুঁজি ভেঙ্গে খরচ করে তাহলে বলা হবে 'তোমার বুদ্ধি নেই, তুমি মূল পুঁজি খরচ কর'। মূলধন আপনার কী কাজে আসবে? তা দিয়ে কি আগুন ধরাবেন? কিন্তু তা খরচ করবেন না। যা নরকে নিয়ে যাবার জিনিস তা কি করে খরচ করা হবে? তাকে যদি খরচ করে দিই তাহলে দুর্গতি কে ভোগ করবে? এই-রকম মানুষ পরমাত্মাকে কি করে পেতে পারেন?

সাধু হোক, গৃহস্থ হোক, শিক্ষিত হোক, মূর্খ হোক, ভাই হোক, বোন হোক—যতক্ষণ সংগ্রহ করবার এবং 'সংগ্রহ বজায় থাকুক'— এর প্রতি রুচি থাকবে ততক্ষণ সে পারমার্থিক পথে চলতে পারবে না। যদি আপনাদের ভিতর

সংগ্রহের রুচি না থাকে তাহলে আপনাদের কাছে লক্ষ কি কোটি কোটি টাকা থাকলেও তা আপনার বাধা সৃষ্টি করবে না। ব্যাঙ্কে অনেক টাকা আছে তা আমাদের বাধা দেয় না। অনেক বাড়ি আছে, সেগুলি আমাদের বাধা দেয় না। বাধা না দেবার কারণ সেগুলির প্রতি আমাদের মায়া-মমতা নেই, সেগুলির প্রাপ্তির ইচ্ছা নেই। যদি আমাদের ইচ্ছা জাগে তাহলেই আমরা ফেঁসে যাব।

যে অল্প কয়েকজন লোককে আমরা নিজের বলে মনে করেছি, যে বাড়িটিকে আমরা নিজের বলে জানি, সেগুলিতেই আমরা বাঁধা পড়েছি। যাদের আমরা নিজের বলে মনে করি না তারা মরে গেলেও তার কোনও প্রভাব আমাদের উপর পড়ে না। যে টাকা-পয়সাকে আমরা নিজের বলে মনে করি না সেগুলি যদি কোথাও চলে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার কোনও প্রভাব আমাদের উপর পড়ে না। যে বাড়িগুলিকে আমরা নিজেদের বলে মনে করি না সেগুলি ধূলিস্যাৎ হলেও তার কোনও প্রভাব আমাদের উপর পড়বে না। অতএব সংসারের বেশি অংশ থেকে তো আমরা মুক্তই, অল্প কয়েকজন মানুষ, সামান্য টাকা-পয়সা, অল্প কয়েকটি বাড়িতে আমরা ফেঁসে গিয়েছি। যদি এই অল্প কয়েকজন মানুষ প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করা যায় তাহলেই উদ্ধার হয়ে যাবেন। বেশির ভাগ মুক্তি তো আমাদের হয়ে গিয়েছে, সামান্যই বাকি। বন্ধন বেশি নয়। বেশি বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যাতে আপনাদের মমতা নেই সেখানে আপনারা বন্ধনহীন আর যেখানে আপনাদের মমতা সেখানেই আপনাদের বন্ধন। কিন্তু আপনাদের মতিগতি হ'ল যেন অনেক মানুষ, অনেক বস্তুর প্রতি আপনাদের মমতা হয়ে যায়। বক্তা চান আর কিছু না হোক শ্রোতার সংখ্যা যেন বেশি হয়। এরকম ইচ্ছা না থাকলে ফাঁসবেন কি করে! তাই বেশি ভোগ হোক, বেশি সংগ্রহ হোক ক্রমশঃ এইরকম ইচ্ছা করতে থাকেন। ইচ্ছা করলে পদার্থ পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া গেলেও তা টিকবে না। আর টিকে যদি যায়ও আপনারা টিকবেন না। কিন্তু বন্ধন হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরও ছাড়া পাবেন না। এবার লাভ-লোকসান আপনারা বিচার করুন।

ম্যায়-ম্যায় বড়ী বলায় হ্যায়, সকো তো নিকসো ভাগ।
কবতক নিবহে রামজী, রুঈ লপেটী আগ।।

তুলার আগুন কতক্ষণ থাকবে? যে বস্তুসমূহে আপনারা আমি-আমার করেন তা কতদিন থাকবে? তা তো থাকবেই না, আপনাদের পতন ঘটাবে—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই প্রত্যেক ভাই-বোনের সংসারে ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছাকে ভিতর থেকে ত্যাগ করা একান্তই প্রয়োজন।

ভিতর থেকে পদার্থসমূহের ইচ্ছাকে ত্যাগ করলে বস্তুগুলি ভাগ্যানুসারে নিজে থেকেই এসে যায়। ইচ্ছা থাকলে টাকা-পয়সা, ভোগবিলাস পরিশ্রম করে, অনেক কষ্ট করে অর্জিত হয়। ইচ্ছা থাকলে সেগুলির প্রাপ্তিতে বাধা আসে, আর পরমার্থতে তো বাধা আসেই। ইচ্ছা থাকলে যদি টাকা-পয়সা এসে যায় তাহলে আমরা তাকে আমাদের সাফল্য বলে মনে করি। আর যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে টাকা-পয়সা এসে গিয়ে সেগুলিই সফল হবে, আমরা টাকা-পয়সার দাস হব না।

আপনারা যদি পরমাত্মতত্ত্বে নিজেদের সদা সর্বদা অবস্থানের অনুভূতি পেতে চান তাহলে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ দূর করুন। বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ দূর হলেই অবিনাশীর দিকে আপনাদের স্বতঃই আকর্ষণ এসে যাবে এবং তাঁর প্রাপ্তি হবে। যদি উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় এমন জিনিসে জড়িয়ে থাকেন তাহলে সর্বদা সঙ্গে থাকলেও অনুৎপন্ন তত্ত্ব পাওয়া যাবে না। তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন এবং কিছুই হবে না। ধন লাভ হবে না, ধন থাকবে না, ভোগ পাবেন না, তা থাকবে না আর আপনারাও থাকবেন না। থাকবে কেবল বন্ধন।

আমি টাকা-পয়সার বিরোধিতা করি না, তার দাসত্বের বিরোধিতা করি। ন্যায় পথে উপার্জন করে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যায় তাহলে প্রসন্ন থাকুন আর লক্ষ লক্ষ টাকা যদি চলেও যায় তবু সেইসকম প্রসন্ন থাকুন। তবেই তো আপনি 'ধনপতি' (ধনের মালিক)। কিন্তু টাকা-পয়সা এলে খুশী হবেন আর চলে গেলে কাঁদতে থাকবেন তাহলে তো আপনারা 'ধনদাস' (ধনের দাস) হলেন, কিছুতেই ধনপতি হলেন না। টাকা-পয়সা চলে গেলে এই মনে করে কাঁদেন যে আপনাদের মালিক (টাকা-পয়সা) চলে গেল, এখন তাদের অভাবে কি করে থাকা যাবে? আরে টাকা-পয়সা চলে গেল তো তাতে কী হ'ল, যিনি তা কামিয়ে ছিলেন তিনি তো আছেন। কিন্তু একথা মাথায় ঢোকে না, কারণ ধনকে নিজেদের ইষ্টদেবতা মেনে নেওয়া হয়েছে। যিনি ধনকে ইষ্টদেবতা মেনেছেন তাঁকে ধন লাভের জন্য মিথ্যা, কপটতা, বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিকে নিজের ইষ্ট তৈরি করতে হয়। কেননা তিনি ধরে রেখেছেন যে এগুলি ছাড়া টাকা-পয়সা রোজগার করা যায় না। অতএব হে মিথ্যা দেবতা! হে কপটতা দেবতা! হে ব্ল্যাক দেবতা! আপনারা প্রসন্ন হন। এই হ'ল তাঁদের ভক্তি। ভগবানের ভক্তরা যেমন ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁর আশ্রয় নেন তেমনই ধনের ভক্তরা মিথ্যা, কপটতা, শঠতা প্রভৃতির আশ্রয় নেন। তাঁদের যদি কেউ বোঝাতে যান তাহলে তাঁরা বলবেন আজকের যুগে কপটতা ছাড়া

কাজ হবে না। এইরকম লোককে ব্রহ্মাও বোঝাতে পারবেন না। তাই যদি পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে চান তাহলে ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হবে। তা নাহলে পরমাত্মপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, তা পাবার সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

অসৎ পদার্থের আশ্রয় ত্যাগ করুন

যেসব বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে সেগুলি ছাড়া আমার চলবে না—এরকম মনে করা স্বয়ং এর মারাত্মক ভুল। স্বয়ং পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ বলে তা সৎ এবং অপরিবর্তনশীল। সংসারে যত বস্তু আছে সব অসৎ ও পরিবর্তনশীল।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'। (গীতা ২/১৬)

'অসৎ-এর সত্তা নেই আর সৎ-এর অবিদ্যমানতা নেই।' শৈশব থেকে আজ অবধি যদি দেখা যায় তো শরীর, শক্তি, যোগ্যতা, খেলা প্রভৃতি বিষয়, সঙ্গী, দেশ, কাল পরিস্থিতি প্রভৃতি সবকিছুর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমি তেমনই আছি। সবগুলি পরিবর্তিত হয়েছে—এগুলি (পরিবর্তনশীল) হ'ল 'অসৎ' আর আমি সেই আছি, এটি (অপরিবর্তনশীল) হ'ল 'সৎ'। নিজে সৎ হয়েও নিজেকে অসৎ-এর এইভাবে অধীন মনে করা যে সেগুলি ছাড়া আমার চলবে না তা খুবই ভুল।

শরীর ছাড়া আমার চলবে না। টাকা-পয়সা, আত্মীয়স্বজন, বাড়ি-ঘর, কাপড়-চোপড়, অন্ন জল, এইসব ছাড়া কাজ হবে না—এ হ'ল অসৎ-এর আশ্রয়। অসৎ-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকত তাহলে অসৎ কেন বলা হবে? যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, যে অন্যের আশ্রিত থাকে, যা নিরন্তর নাশপ্রাপ্ত হয়, অদৃশ্য হতে থাকে, যা সর্বদা অবিদ্যমান তারই নাম হ'ল অসৎ। স্বয়ং সৎ হয়েও অসৎ-এর আশ্রয় নেওয়া, অসৎ-এর অধীন হয়ে যাওয়া আর সেই পরাধীনতায় স্বাধীনবুদ্ধি করে নেওয়া—এটি বিশেষ ভ্রম।

পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীন বুদ্ধি কি করে হয় তা আপনারা জেনে নিন। মনে করুন আপনাদের একটি চশমার প্রয়োজন। এবার মনে হ'ল 'একটা চশমা তো চাই। কী করি? কাকে বলি? কে এনে দেবে?' আমাদের কাছে টাকা নেই, তাই আমরা পরাধীন। যদি টাকা থাকত তাহলে পরাধীন হতাম না, টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তা আনিয়ে নিতাম। এইভাবে টাকা না থাকায় আপনারা

নিজেদের পরাধীন মনে করেন। এবার মনে করুন তো আপনারা নিজেরাই কি টাকা? টাকাও তো 'পর'। আপনারা টাকার অধীন হলেও নিজেদের স্বাধীন মনে করেন— এইটিই হ'ল পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধি।

পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধি থাকার মতো অনর্থ আর কিছু নেই। সমস্ত পাপ হ'ল এর সন্তান। পাপ, অন্যায়, মিথ্যা, কপটতা, নরক প্রভৃতি সবকিছুই এই বুদ্ধি থেকে আসে। আপনারা ভেবে দেখুন যে টাকা-পয়সা 'স্ব', না 'পর'! টাকার অধীন হওয়া স্বাধীনতা, নাকি পরাধীনতা? কিন্তু আপনারা পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা মেনে নিয়ে ভাবেন যে আপনাদের কাছে যদি টাকা-পয়সা থাকত তাহলে তৎক্ষণাৎ রেলে করে, বিমানে করে চলে যেতেন; এটা কিনতেন, সেটা কিনতেন। এ হ'ল অর্থের পরাধীনতা। টাকা-পয়সা ছাড়া জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, এ হ'ল প্রত্যক্ষ, তাহলে আমরা কবে স্বাধীন হব? আমরা স্বাধীন তখনই হব যখন কোনও কিছুর প্রয়োজন আমাদের হবে না। চশমা, অন্ন-জল, পরিধেয় কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। কখন এমন হবে? এ তখন হবে যখন আপনারা স্বয়ংকে শরীর থেকে ভিন্ন অনুভব করবেন।

আপনারা যখন শরীরের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যান তখন শরীরের প্রয়োজন আপনাদের প্রয়োজন হয়ে যায়। যেমন, কোনও বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য কানের দুল কিংবা শাড়ী ইত্যাদি কিনতে যায় তখন সে দোকানদারকে বলে যে তার দুল বা শাড়ী চাই। দোকানদার যদি বলে যে তুমি কি এগুলি পরবে? তখন সে বলে, না আমার জন্য নয়, আমার স্ত্রীর জন্য চাই। সে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ করে নিয়েছে বলে স্ত্রীর প্রয়োজন তার নিজের প্রয়োজন হয়ে গিয়েছে। তেমনিভাবে শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' করে নিলে শরীরের প্রয়োজনগুলিকে নিজের প্রয়োজন বলে মনে হয়। বাস্তবে এগুলি আপনাদের প্রয়োজন নয়, এগুলি শরীরের প্রয়োজন। আপনাদের কোনও বস্তুর একেবারেই প্রয়োজন নেই।

শ্রোতা—শরীর থেকে আমি ভিন্ন, এই অনুভূতি তো হয় না। কী করব?

স্বামীজী—আমি-ই শরীর এবং শরীর-ই আমার—এই হ'ল অসৎ-এর সঙ্গ। আপনি সৎ এবং শরীর অসৎ। আপনি অবিনাশী এবং শরীর বিনাশশীল। তাহলে আপনি এবং শরীর এক কি করে হলেন?

শ্রোতা—এই কথা তো জানি। কিন্তু জানাটা তো টিকে থাকে না।

স্বামীজী—টিকে থাকে না বলে কি দুঃখ হয়? টিকে থাকলে লাভ আর না থাকলে লোকসান এমন মনে হয় কি? যদি আপনি 'আমি শরীর থেকে ভিন্ন'— এই জ্ঞানকে বাস্তবে টিকিয়ে রাখতে চান তাহলে তাতে কোনও বাধা

নেই। কিন্তু আপনারা তাকে টিকিয়ে রাখতে চান না। এটি টিকে না থাকায় আপনাদের দুঃখ হয় না। এখন তো আপনি বলছেন যে এটি টিকে থাকে না, কিন্তু অন্য সময়েও কি এর কথা মনে আসে?

আপনারা শরীরের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, এমন নয়। বাস্তবে শরীরের প্রয়োজন নিজে থেকেই মেটাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রারব্ধ পহলে রচা, পীছে রচা শরীর।
তুলসী চিন্তা কেঁও করে, ভজ লে শ্রীরঘুবীর।।

শরীর-নির্বাহ করবার ভার (দায়িত্ব) আপনাদের নয়। আপনারা শরীর-নির্বাহের কথা চিন্তা করে জেনে বুঝে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। বাস্তবে শরীরের নির্বাহ যেমন হবার তেমনই হবে, চেষ্টা করলেও তাই হবে, আর না করলেও তাই হবে। ভাগ্যে যদি না-খেয়ে মরা লেখা থাকে তাহলে যত চেষ্টাই করুন না কেন না খেয়েই মরতে হবে। আর মৃত্যু যদি না থাকে তাহলে কোনও চেষ্টা না করলেও শরীর-নির্বাহ হয়ে যাবে।

এই কথাটি মনে রাখুন যে আপনাদের শরীর-নির্বাহের জন্য পরমাত্মার তরফ থেকে ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু আপনাদের তৃষ্ণা পূর্তির ব্যবস্থা করা নেই। একবারেই নেই। এত, এত চাই, এই যে আপনাদের আকাঙ্খা, তা মেটাবার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আপনাদের শরীর-নির্বাহের জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। যিনি জন্ম (জীবন) দিয়েছেন জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। আমাদের মায়েদের স্তনদুগ্ধ কি আমরা তেরি করেছি? মায়ের দুধ তৈরি করবার জন্য আমরা কেউ কি কোনও উদ্যোগ নিয়েছি? মায়ের দুধের যিনি ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি কি বদলে গিয়েছেন? তিনি কি মৃত? এখন কি নতুন কিছু হয়েছে? তাই শরীর-নির্বাহের জন্য কখনও চিন্তা করা উচিত নয়। চেষ্টা করতে আমি বারণ করছি না। কেবল নির্বাহ করবার জন্য চেষ্টা করুন। তার কারণ কর্মের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ আছে। অতএব কর্ম করুন, কিন্তু চিন্তা করবেন না।

মোটরের চারটি অবস্থা। ১। মোটর গ্যারেজে রয়েছে সেইসময় ইঞ্জিনও চলে না, চাকাও চলে না। দুটিই বন্ধ। ২। যখন মোটর চালু করেন তখন ইঞ্জিন চলে, কিন্তু চাকা চলে না। ৩। যখন মোটরকে যেখান থেকে রওয়ানা করান তখন চাকাও চলে, ইঞ্জিনও চলে। ৪। চলতে চলতে যদি ফাঁকা জায়গা পড়ে, অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়, গাছ-টাছের কোনও বাধা না থাকে এবং রাস্তাও কিছুটা ঢালু থাকে তাহলে সেইসময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেও চাকা চলতে থাকবে—মোটর চলতে থাকবে এবং তেল খরচ হবে না।

এইভাবে মোটরের চারটি অবস্থা। এই চারটি অবস্থার মধ্যে সেইটিই সবচেয়ে ভাল অবস্থা হ'ল যখন চাকা চলবে কিন্তু ইঞ্জিন চলবে না অর্থাৎ তেল খরচ হবে না অথচ দূরত্ব অতিক্রম হয়ে যাবে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হ'ল যখন ইঞ্জিন চলবে, কিন্তু চাকা চলবে না অর্থাৎ তেল খরচ হবে কিন্তু এগোনো যাবে না। এইভাবেই আপনারা ভেতরে চিন্তা করেন—এইটিই আপনাদের খারাপ অবস্থা। কিন্তু আপনারা যদি চিন্তা না করে কর্তব্য করেন তাহলে সেইটিই হবে ভাল অবস্থা। গীতা একেই 'কর্মযোগ' বলেছে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।

(গীতা ২/৪৭)

'তোমার কেবল কর্ম করবারই অধিকার, ফলের কখনওই নয়। অতএব তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না আর অকর্মণ্যতাতেও আসক্তি রেখো না।'

কখনও অকর্মণ্য হয়ো না। কর্তব্য করতে থাক, কিন্তু ফলের ইচ্ছা করো না। কী পাবে, কি করে হবে তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। ইচ্ছা করলে, চিন্তা করলে বস্তু পাওয়া যাবে না। বস্তু কর্ম করলে পাওয়া যায়, তা সেই কর্ম পূর্বেকার ভোগ্য (প্রারব্ধ) অথবা বর্তমানের যাই হোক। এইজন্য কাজ করো। ভেতরের ইঞ্জিনকে কেন চালাও অর্থাৎ চিন্তা কেন করো?

চিন্তার বিষয়ে আর একটি কথা বোঝবার আছে। মনের দুটি বৃত্তি—একটি বিচার এবং অন্যটি চিন্তা অর্থাৎ ভাবনা। বিচারের দ্বারা বুদ্ধি বিকশিত হয় আর চিন্তায় বুদ্ধি নষ্ট হয়—**'বুদ্ধিঃ শোকেন নশ্যতি'**। বিচার করে কোনও কাজ করলে সেই কাজ খুব ভাল হয়। কিন্তু যদি চিন্তা হয় তাহলে সেই কাজ খারাপ হয়ে যাবে, তাতে ভুল হবে। যার ভিতর চিন্তা-ভাবনা হয় সেই ব্যক্তির ধৈর্য থাকে না, তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য চিন্তা না করে সব কাজ বিচার-বিবেচনা পূর্বক করুন। ছোট-বড় যে কাজই করুন, ভেবে-চিন্তে ঠিকভাবে করুন।

নিজেদের শারীরিক প্রয়োজনগুলি আমরা পূর্ণ করে নেব এ জিনিস মোটেই আমাদের হাতের মধ্যে নয়। বাস্তবে প্রয়োজন কিছুই নেই; কেননা শরীরও বাস্তবিক নয়, তাহলে তার প্রয়োজন বাস্তবিক হবে কি করে? আপনারা স্বয়ং বাস্তবিক, এইজন্য আপনাদের (স্বয়ং-এর) প্রয়োজনই হ'ল সত্যকার প্রয়োজন। আপনাদের প্রয়োজন হ'ল আত্মতত্ত্বকে লাভ করা। শরীর-নির্বাহের প্রয়োজন যদি পূর্ণ হবার হয় তাহলে তা পূর্ণ হবে আর পূর্ণ হবার না হলে তা পূর্ণ হবে না; কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বের প্রয়োজন আপনারা চাইলে

নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে; কেননা তার জন্যই মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে। এই মনুষ্য-শরীর খাওয়া-পরার জন্য প্রাপ্ত হয়নি। আমি শাস্ত্রে কোথাও এমন কথা পড়িনি যে মনুষ্য শরীর টাকা-পয়সা রোজগার করবার জন্য অথবা ভোগ করবার জন্য পাওয়া গিয়েছে। চিরকালের জন্য কল্যাণ হয়ে যাক, উদ্ধার হয়ে যাক, তার জন্যই মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ে এক বড় রহস্য, গুপ্ত কথা হ'ল যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি শরীরের দ্বারা হয় না। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি বিবেকশক্তিতে হয়, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধির দ্বারা হয় না। সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার প্রভৃতিকে ভালভাবে জানার জন্য মানুষেরা যে বিবেকশক্তি পেয়েছে তার দ্বারা উদ্ধার হবে। সেই বিবেক-শক্তিকে সদুপযোগ করলে সাংসারিক কাজও ভাল হবে এবং পারমার্থিক কাজও ভাল হবে। তাই সেই বিবেকশক্তিকে যেন সদুপযোগ করা হয়। তারই জন্য মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

নিঃস্বার্থ সেবার মহত্ত্ব

হাত, পা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সবগুলি একটি শরীরের অনেক অবয়ব আর এই সবগুলি সমবেত হয়ে শরীর-নির্বাহের কাজ করে। এই সবগুলির কাজ আলাদা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করলেও এরা পরস্পর একে অন্যের হিতসাধনে লেগে থাকে। অনুরূপভাবে সংসারে যে অনেক প্রাণী রয়েছে তাদের সকলকেও মিলিত হয়ে সামগ্রিকভাবে সংসারের কল্যাণের জন্য কাজ করা উচিত। যখন তারা কেবল নিজেদের জন্য কাজ করে তখনই ভুল হয়। যেমন, হাত কেবল নিজের জন্যই কাজ করল। পা, চোখ, কান প্রভৃতি কারও জন্য কিছু করল না, তাহলে শরীরের নির্বাহ হবে না। পা যদি বলে যে আমি কেবল নিজের জন্য কাজ করব, শরীরের জন্য কেন করতে যাব, হাতের জন্য করব কেন? তাহলে শরীরের কাজ হবে না। এইভাবে স্বার্থ পরবশ হয়ে সকল প্রাণী যদি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে চায় তাহলে সংসারের কাজ হবে কি করে? নিজেদের স্বার্থের জন্য কাজ করলেই কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

সকল প্রাণী একটি সংসারেরই অনেক অবয়ব। কোনও প্রকারেই শরীর সংসার থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে না। শরীরের উপাদানের দৃষ্টিতে, ধাতুর দৃষ্টিতে, সংরক্ষকের দৃষ্টিতে যদি দেখেন তাহলেও শরীরকে সংসার

থেকে আলাদা প্রমাণ করতে পারবেন না। যেমন, শরীরের অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন হয়েও একই শরীরের অঙ্গ তেমনি সংসারে ছোট বড় যত প্রাণী আছে সবই এক বিরাট সামগ্রিক সংসার-এর অঙ্গ। এক বিরাটের অঙ্গ হয়েও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করতে চায়, ভুল এখানেই।

নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করুক বা নাই করুক সে সম্পর্কে পশুপাখিদের কোনও জ্ঞান নেই, কিন্তু মানুষদের সে বিষয়ে জ্ঞান (বিবেক) আছে। মানুষ বিবেকের সাহায্যে চিন্তা করতে পারে যে সমগ্র পৃথিবী আমার স্বজন, তাহলে কেবল নিজের স্বার্থের জন্য কি করে কাজ করতে পারি। নীতিতেও আছে—

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

(পঞ্চতন্ত্র, অপরীক্ষিত ৩৭)

এটি আমাদের আর ঐটি অন্যের (পরের)—এমন ভাবনা তো তুচ্ছ হৃদয়ের লোকেদের হয়, যাদের হৃদয় উদার তাদের কাছে তো সমগ্র পৃথিবীই আপন।

পৃথিবীর সকল প্রাণীই, স্থাবরই হোক আর জঙ্গমই হোক, নিজের স্বজন। শাস্ত্র বলেছে যে নিজেদের ঘরে যারা থাকে তারা যেমন আত্মীয়স্বজন তেমনি নিজেদের ঘরের পিঁপড়ে, মাছি, ইঁদুরও স্বজন। তারা সেই ঘরকে নিজেদের বলে মনে করে। পাখিরা সেই ঘরে যেখানে তাদের বাসা বাঁধে সেখানে অন্য পাখিকে থাকতে দেয় না। চিন্তা করুন, একটা ঘরের মধ্যে কত ঘর, সকলেরই নিজের নিজের ঘর। তাই ঘরকে কেবল নিজের মনে করা আর নিজের ঘরের জন্য সবকিছু কাজ করা পশুতা, মনুষ্যত্ব নয়। ভাগবতে বলা হয়েছে যে এই পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর—**'পশুবুদ্ধিমিমাং জহি'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/৫/২)। সকলের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ মনে করাই হ'ল মনুষ্যবুদ্ধি।

বর্তমানে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে দেরী হচ্ছে তার প্রধান কারণ হ'ল এই যে আপনারা কেবল ব্যক্তিগত হিত চান অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তি সত্তাকে, পরিছন্নতাকে বজায় রাখেন। আমার মুক্তি হোক, আমার সুখ হোক, আমার কল্যাণ হোক, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক— এই ব্যক্তিসত্ত্বা, একদেশীয়তাকে আপনারা ত্যাগ করেন না, পশুর যা স্বভাব তাকে নিয়েই আপনারা কাজ করেন।

গীতায় বলা হয়েছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।
(গীতা ৩/১০-১১)

'প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকালে কর্তব্য-কর্মের বিধানসহ প্রজা সৃষ্টি করে তাদের (প্রধানত মানুষকে) বললেন, তোমরা স্বীয় কর্তব্যের দ্বারা নিজেদের বৃদ্ধি কর আর সেই কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ তোমাদের কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকারী হোক। তোমাদের কর্তব্য-কর্মের দ্বারা তোমরা দেবতাদের উন্নত কর এবং সেই দেবতারা তাঁদের কর্তব্যের দ্বারা তোমাদের উন্নত করুন। এইভাবে পরস্পরকে উন্নত করতে থাকায় তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

তাৎপর্য হ'ল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবীর দেবতা তথা চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতা সকল জীবেদের বৃদ্ধি করেন। তাদের পালন করেন, সেবা করেন। মানুষ যজ্ঞ (কর্তব্যের) দ্বারা দেবতাগণের পূজা করবে, তাঁদের উন্নত করবে, সেবা করবে। এখানে 'দেবতা' শব্দ কেবল উপলক্ষ মাত্র; অতএব 'দেবতা' শব্দের মধ্যে সকল প্রাণীকে ধরে নিতে হবে। মানুষের কর্তব্য সকল প্রাণীর কল্যাণ চাওয়া, তাদের সেবা করা। এইজন্য লোকেদের আপন কর্তব্য পালনের দ্বারা অপরের সেবা করা উচিত। যেমন, ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণোচিত কর্মের দ্বারা সকলের সেবা করবেন। ক্ষত্রিয় তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত কর্মের দ্বারা সকলের সেবা করবেন। বৈশ্য এবং শূদ্র তাঁদের নিজেদের কর্মের দ্বারা সকলের সেবা করবেন। এইভাবে একে অপরের সেবা করে পরম শ্রেয়কে লাভ করবে।

পরমশ্রেয়ের প্রাপ্তিতে আপন স্বার্থ ভাবনাই হ'ল বাধা। আপনাদের কাছে যত বস্তু আছে তা সবই সমষ্টির, সকলের সেবার্থে, সেই বস্তুগুলির দ্বারা নিজেদের নির্বাহও আপনারা অপরের সেবার জন্য করবেন, নিজেদের সুখভোগের জন্য করবেন না। '**এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ**' (মানস ৭/৪৪/১)। মনুষ্য-শরীরের উদ্দেশ্য বিষয়ভোগ করা, সংসারের সুখ পাওয়া নয়, বরং তা হ'ল সকলের সেবা করা। তাই সকলের সুখ কিভাবে হবে, সকলে কি করে আরাম পাবে, সকলের ভাল কি করে হবে— এই চিন্তা করুন, বিচার করুন। ব্রহ্মা বলেছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।।
(গীতা ৩/১২)।

'যজ্ঞের দ্বারা ভাবিত (পুষ্ট) দেবতাগণও আপনাদের কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিতে থাকবেন। এইভাবে দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী অন্যের সেবায় না লাগিয়ে যে মানুষ নিজেই উপভোগ করে সে 'চোর।'

মানুষ যে সামগ্রীগুলি পেয়েছে সেগুলি সকলের সেবার কাজে লাগাবার জন্যই সে পেয়েছে, কেবল নিজের ভোগের জন্য নয়। যে সেগুলি একলা ভোগ করে তাকে চোর বলা হয়েছে—**'স্তেন এব সঃ'**। প্রাপ্ত জিনিসগুলি যদি নিজের ভোগের জন্য হোত তাহলে তাকে চোর বলা হোত না। তাই মানুষ যা কিছুই পেয়ে থাকে তা একলা ভোগ করবার অধিকারী সে নয়। যেমন, পরিবারের কোনও লোক অর্থ উপার্জন করলে সেই অর্থের উপর তার একার অধিকার থাকে না, বরং তার উপর (অর্থের উপরে) পরিবারের সকলের অধিকার থাকে। সে যদি তার স্ত্রীকে বলে 'আমি একেলাই খাব, তুমি তো ঘরে বসে থাক, তোমাকে কেন দেব'? মা-বাবাকে বলে 'আপনারা শুধু শুধুই বসে থাকেন, আপনাদের কেন দেওয়া হবে? আমি শ্রম করেছি, আমি রোজগার করেছি, অতএব আমি একলাই ভোগ করব'— তাহলে এইরকম পরিস্থিতিতে কি পরিবারে সুখ-শান্তি থাকবে? সংসারের কাজ-কর্ম কি সঠিকভাবে চলবে? কখনও নয়। এইভাবে লোকেরা যদি নিজেদের স্বার্থ পূর্তিতেই লেগে থাকে তাহলে সৃষ্টির কাজ ভালভাবে চলবে না।

আমাদের কাছে যা কিছু আছে সবই আমরা সংসার থেকে পেয়েছি। শরীর এবং তার জন্য অন্ন, জল, বস্ত্র, বাতাস, আশ্রয় প্রভৃতি সবই সংসার থেকে পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি ধনবান ব্যক্তি, রাজা-মহারাজাও বলতে পারেন না যে তাঁরা অন্যের সেবা না নিয়ে নিজেদের জীবন-নির্বাহ করে নিতে পারবেন। করবেন কি করে? তিনি যে পথের উপর দিয়ে হাঁটবেন সেই পথ কি তিনি তৈরি করেছেন? কোনও গাছের তলায় যদি দাঁড়ান তো সেই গাছ কি তাঁর লাগান? কোথাও যদি জল খান তো সেই কূয়া কি তাঁর খোঁড়া? তাঁকে সংসার থেকে তো নিতেই হবে, পরবশ হয়ে নিতে হবে। পশুদেরও তো নিতে হয়। তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য আর কী হ'ল! যদি নিয়ে থাকেন তাহলে দিতে হবে, পরবশ হয়ে যা নিয়েছেন তার চেয়ে বেশি দিতে হবে— এই হ'ল মানুষের বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য। ভগবান বলেছেন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২/৪) যে মানুষ প্রাণীমাত্রেরই হিতে রত থাকেন তিনি আমাকেই লাভ করেন। প্রাণীমাত্রেরই হিতে রত হতে হবে। তাঁর হিতসাধন

করবেনই—এতে আপনি সমর্থ নাও হতে পারেন। সমগ্র সংসার মিলিতভাবেও একজন লোকের ইচ্ছাও পূর্ণ করতে পারে না। তাহলে একজন মানুষ সমস্ত সংসারের ইচ্ছা কি করে পূর্ণ করে দেবে? এর তাৎপর্য এই যে—মানুষের কর্তব্য হ'ল তার কাছে যে সামগ্রী আছে তা উদার হস্তে অন্যের হিতের জন্য সমর্পিত করা। এমন করলে তার কল্যাণ প্রাপ্তি হবে।

মানুষের মধ্যে যত ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ থাকবে সংসারে তাকে ততই নীচ মনে করা হবে। যে শুধুমাত্র নিজের উদর পূরণেই ব্যস্ত, নিজেই সবকিছু ভোগ করতে চায়, বাড়ির লোকেরাই তাকে মান্য করে না। প্রতিবেশীর আর কথা কি! সে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে আত্মীয়স্বজনের সেবা করবে তাকে ততই ভাল মনে করা হবে। যদি সে কেবল আত্মীয়স্বজন নয় প্রতিবেশীদের কল্যাণ চায় তাহলে সে আরও ভাল হবে। কেবল প্রতিবেশীদের নয় সমগ্র গ্রামের কল্যাণ যদি সে চায় তাহলে সে তার চেয়েও ভাল হবে। আর যদি সে গ্রামেরই নয় প্রদেশেরও ভাল চায় তাহলে সে তো আরও বেশি ভাল হবে। কেবল প্রদেশই নয় সমগ্র দেশেরও যদি সে ভাল চায় তাহলে সে আরও ভাল হবে। যদি সে দেশ-বিদেশের, সমগ্র পৃথিবীর ভাল চায় তাহলে আরও ভাল হবে। সে যদি দেবতা, পশু, পাখি, বৃক্ষ প্রভৃতি সকল জীবের ভাল চায় তাহলে সে আরও ভাল হবে। আর সে যদি ভগবানের সেবা করে, ভগবানের ভজন-কীর্তন-ধ্যান করে তাহলে সে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। যেমন গাছের শিকড়ে জল দিলে সারা গাছ সবুজ হয়ে যায় তেমনি সংসাররূপী গাছের মূল ভগবানের চিন্তন করলে, ভজনা করলে সমগ্র সংসারের স্বতঃই সেবা হয়ে যায়।

সিদ্ধান্ত হ'ল এই, মানুষের সেবা যতই ব্যাপক হবে ততই সে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা সৃষ্টি থেকে পেয়েছি। এইজন্য খুবই সততার সঙ্গে সেগুলিকে সৃষ্টির সেবায় লাগাতে হবে। এই হ'ল গীতার কর্মযোগ।

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!